বড় হুজুরের কেরামতি

- সৈকত রহমান

টিকেটটা কাটতে পেরে স্বস্তি পেলাম। স্টেশনটা বড়। এদিক ওদিক ঘুরে দেখছি আর ট্রেনের সময় গুণছি। এমন সময় ঘোষণা এলো, ট্রেন নির্ধারিত সময়ের তিন ঘণ্টা পরে আসবে। এখন? বাংলাদেশের ট্রেনের টাইম, এ নতুন কিছু নয়।

কি আর করা! অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বসে থেকে একটু বাইরের দিকে এলাম, দেখলাম ট্রেনের অপেক্ষমাণ যাত্রীরা একটা দরবেশ টাইপের লোকের কথা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে।

আমিও সেখানে গেলাম।

দরবেশ বলছেন, মহব্বত একটা বড় জিনিস, বিশেষ করে নর-নারীর মহব্বত আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। কেতাবে আছে, স্বামী-স্ত্রী যখন একে অপরকে ভালোবেসে আল্লাহকে স্মরণ রেখে মিলিত হয় তখন আল্লাহ এতোই খুশি হন যে, ফেরেস্তাদেরকে ডেকে বলেন, ও ফেরেস্তারা, তোমরা আমাকে মানুষ সৃষ্টি করতে নিষেধ করে বলেছিলে যে, তারা দুনিয়াতে হানাহানিতে লিপ্ত হবে আর এখন দেখো তারা একে অপরকে কেমন ভালোবাসে। এমন স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে আল্লাহ খুশি হয়ে তার বান্দাদের আগের অনেক গুনাহ মমাফ করে দেন।

দরবেশের এসব কথা চলছে আর আমার পাশের এক লোককে ফুপিয়ে কাদতে দেখে আস্তে করে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, কাদছেন কেন?

সে বললো, আমার স্ত্রীর খুব অসুখ, ওষুধ নিতে শহরে এসেছিলাম, বাড়ি ফিরতে দেরি হলে হয়তো তাকে আর বাচানো যাবে না। বলা শেষ না হতেই জোরে জোরে কাদতে লাগলো।

এদিকে দরবেশ বলতে লাগলেন, হে খোদা, তোমার এক বান্দা তার বিবির জন্য কাদছে, তুমি তার বিবিকে সুস্থ করে দাও। আরো বললেন, ধৈর্য ধরুন, ট্রেন এ স্টেশন থেকে মাত্র তিন স্টেশন দূরে আছে।

এমন সময়ই ঘোষণা এলো, ট্রেন মাত্র তিন স্টেশন দূরে এবং ঘোষিত সময়ের আগেই ট্রেন চলে আসবে।

অবাক হলাম ইনি কতো বড় পীর রে বাবা! যে ট্রেন কোথায় আছে বলে দিতে পারলেন? আর এ লোকটার স্ত্রী যে অসুস্থ তা ওই দূর থেকে দরবেশ জানলেন কি করে? এমন কেরামতি দেখে অনেকেই দরবেশের পা ছুয়ে পড়ে গেল।

দরবেশ বলছেন, নারীরাও যেন তার স্বামীকে ভালোবাসে।

এ প্রসঙ্গে তিনি একটা গল্প বলতে লাগলেন। এক পরহেজগার নারী এক বুজুর্গ হুজুরের কাছে গিয়ে বললেন, হুজুর, আমার এক সন্তান যেদিন মারা যায় সে রাতেই আমার স্বামী সহবাস করতে চায়, এতে আমি সম্মত হইনি। এখন আমার মনোবেদনা হচ্ছে যে, তার আবেদনে সাড়া না দিয়ে আমি অপরাধ করে ফেলেছি। এ ব্যাপারে আমাকে বলো যে, প্রিয় সন্তান হারানোর দুঃখ-কষ্টের সময় আমার কি করা উচিত ছিল?

হুজুর বললেন, কথা হচ্ছে, স্বামী যদি স্ত্রীর স্তন দিয়ে কাবাব বানিয়েও খেতে চায় তবে স্ত্রীর তা পরম পাওয়া মনে করে তৎক্ষণাত সেটাই করা উচিত। আর মিলিত হওয়ার ফলে তো সে রাতেই খোদা আপনাকে আরো একটা সন্তান দান করতে পারতো।

দরবেশ বললেন, এ দুনিয়া ক্ষণিকের, আজ আছি কাল নেই, কোনো কিছুই আমরা সঙ্গে নিতে পারবো না। সব কিছু ছেড়ে যেতে হবে। মনে রাখবেন, যখন দুনিয়াদারি কাজ করবেন তখন মনে করবেন, দুনিয়াতে কাজ ছাড়া অন্য কিছু নেই আর যখন নামাজে দাড়াবেন তখন মনে করবেন সারা জীবন নামাজে থাকবেন। দুনিয়ার সব কিছু ভুলে যাবেন। এটাই হচ্ছে খাস ইবাদত।

চারদিকে আজান শুরু হলো তখন।

দরবেশ বললেন, আপনারা সবাই এখানেই নামাজ পড়বেন।

ইমামতির দায়িত্ব নিলেন ওই দরবেশ।
বললেন, আপনাদের ব্যাগ, মাল–সামানা যা আছে তা আমার সামনে রেখে যান।
নামাজ পড়ি না পড়ি দরবেশের কথায় সবাই নামাজে দাড়ালাম। নামাজ পড়তে দাড়ালেই আমার দুনিয়ার কথা মনে আসে, নামাজ শেষে কি খাবো, কার কাছে কতো টাকা পাবো, ওই মেয়েটা কতো সুন্দর ইত্যাদি।
দরবেশ সেজদায় আছেন আর আমি এসব ভাবছি।
সময় যাচ্ছে, দরবেশ উঠছেন না। ভাবছি, কামেল পীররা মনে হয় এভাবেই দীর্ঘক্ষণ সেজদায় থাকেন আর সৌভাগ্য আমরা এমন পীরের সঙ্গে নামাজ পড়তে পারছি। সেজদায় থেকে বার বার একটা প্রশ্ন মাথায় আসছে, তিনি কতো বড় পীর যে মানুষের মনের খবর এবং ট্রেন কতো দূরে আছে বলে দিতে পারছেন?
ইমামের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত নামাজ ছাড়া গুনাহ জেনেও এক যাত্রী তার ব্যাগে অনেক মূল্যবান জিনিস আছে ভেবে নামাজ ছেড়ে দেখলেন কোনো ব্যাগ, মাল–সামান নেই।
দরবেশও নেই।
যাত্রীটির চিৎকারে সবাই নামাজ ছেড়ে হায় হায় করতে লাগলো।
পাঠক, পীরের কেরামতির রহস্য জানা থাকলে জানাবেন।

ঢাকা থেকে

ডাকাতি

- আশরাফুল ফয়সাল

মামাবাড়ি থেকে বাড়ি আসার জন্য খুলনা থেকে ঢাকাগামী *উপবন* ট্রেনের একটি বগিতে সিট নেই। আমার গন্তব্য সিরাজগঞ্জ। দীর্ঘ যাত্রা। তাই একটু ঘুমানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ঘুম আসছিল না। তবু চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম।
হঠাৎ শুনতে পেলাম ট্রেনের ভেতর চাপা গুঞ্জন। চোখ খুলে দেখতে পেলাম দুইজন অস্ত্রধারী ট্রেনে দৌড়াদৌড়ি করছে। বুঝলাম ট্রেনে ডাকাত পড়েছে।
জীবনে এই প্রথম ডাকাতের কবলে পড়েছি। আশপাশে তাকিয়ে দেখি ডাকাতের সংখ্যা প্রায় পাচজন। ডাকতরা বলছে, যার কাছে যা কিছু আছে বের করেন। কেউ কিছু লুকানোর চেষ্টা করবেন না। যদি কেউ কিছু লুকানোর চেষ্টা করেন তাহলে জানে মেরে ফেলবো।
ডাকাতের কথা শুনে মহিলা যাত্রী সবাই কান্নাকাটি শুরু করলো।
আমার ভয় হলো, সদ্য কেনা মোবাইলটি যদি ডাকাতরা নিয়ে যায় তাহলে বিপদে পড়তে হবে। অল্প অল্প টাকা জমিয়ে সেটটি কিনেছিলাম।
মোবাইলটি অফ করে সিটের এক পাশে লুকিয়ে রাখলাম। তারপর পকেটের এক হাজার তিনশ টাকা থেকে বিশ টাকা পকেটে রেখে মোবাইলের পাশে লুকিয়ে রাখলাম।
স্থিরভাবে সিটে বসে ভাবছি, দেখা যাক ভাগ্যে কি ঘটে!
ডাকাতরা যাত্রীদের কাছ থেকে মালামাল তুলতে শুরু করেছে। আমার কাছ থেকে দুই সিট সামনে এক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন, কানের দুল খুলে নিচ্ছে।
মহিলাটি জোরে জোরে তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।
ডাকাতটির সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তার নিজের কাজ করাতে সে ব্যস্ত।
এবার এক ডাকাত আমার কাছে বললো, যা আছে বের করেন। আমাদের সময় নেই। তাড়াতাড়ি করেন।
আমি কোনো কথা বলছি না দেখে সে আমার শরীর চেক শুরু করলো।

আমার কাছে মাত্র বিশ টাকা পেয়ে ধমক দিয়ে বললো, ফকিরের বাচ্চা, বিশ টাকা নিয়ে ট্রেনে যাস। হেটে যেতে পারিস না? বলে আমার গালে একটি চড় বসিয়ে দিল।

রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু ডাকাতের হাতে বন্দুক থাকায় তাকে কিছুই বলতে পারলাম না। এই সব দুর্ঘটনা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল।

ডাকাতরা সব যাত্রীদের মালামাল নিয়ে চলে গেল।

এবার শুরু হলো যাত্রীদের আর্তনাদ। কেউ বলছে, আমার সব নিয়ে গেল। আবার কেউ বলছে, আমাকে ফকির বানিয়ে দিল।

তখন বুঝতে পারলাম মাঝে মধ্যে নির্জন স্থানে কেন ট্রেন থামানো হয়। আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ দিলাম। ডাকাতরা আমার কিছুই নিতে পারেনি।

নেত্রকোনা থেকে

অভদ্র প্রস্তাব

- জেসমিন চৌধুরী

লিটনভাই আমার খালাতো ভাই। লিটনভাইয়ের সঙ্গে আমাদের নতুন আরেকটা সম্পর্ক আছে। ওনার সঙ্গে আমার বোন নাজমিনের বিয়ে হবে। সব ঠিকঠাক। আপার আকদও হয়ে গেছে। শুধু আম্মার আমেরিকার ভিসা পাওয়ার অপেক্ষা। আম্মা আমেরিকার ভিসা পেলে বিয়ে হয়ে যাবে। আম্মা ভিসা পেলে আমরাও ভিসা পেয়ে যাবো।

ভিসা পাওয়ার আগে নাজমিনআপার বিয়ে হলে আমেরিকার ভিসা পেতে ওনার দেরি হবে।

একদিন লিটনভাই ট্রেনের তিনটি টিকেট নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য ঢাকা যাবো। সেখান থেকে কুয়াকাটা যাবো। সেখানে লিটনভাইয়ের বন্ধু শান্ত আছেন। তিনি সেখানে আমাদেরকে সব দেখাবেন।

আম্মা না করেননি।

জুনের এক দিনে লিটনভাই, নাজমিনআপা ও আমি রওনা হয়েছিলাম। ট্রেনে ঢাকা পর্যন্ত যাবো। ঢাকা থেকে বরিশাল হয়ে কুয়াকাটা। ঢাকায় এক রাত থাকবো। সেখান থেকেই প্ল্যান করা হবে বরিশাল গাড়িতে যাবো, নাকি লঞ্চে যাবো?

চেয়ারকোচের সিট। ট্রেন স্টেশনে আসার আগে লিটনভাইকে বললাম, পাশাপাশি সিটে তিনি আর নাজমিনআপা বসবেন। একা সিটে আমি।

লিটনভাই না না করে উঠলেন।

বললাম, ঢাকা পর্যন্ত ওনারা যেন পাশাপাশি সিটে বসে আড্ডা দিয়ে যান।

ট্রেন আসার পর উঠলাম। সামনের করিডরের পাশের সিটে আমি। পেছনের দুই সিটে বসেছেন লিটনভাই ও নাজমিনআপা। আমার পাশে একজন ভদ্রলোক বসেছেন। ওনার বয়স পয়ত্রিশ-চল্লিশ হবে।

ঠিক করেছিলাম লিটনভাই ও নাজমিনআপাকে ডিস্টার্ব করবো না।

আমার পাশের ভদ্রলোক ট্রেনের জানালার পাশের সিটে বসে আছেন। ইচ্ছা হলো একবার ওনাকে প্রস্তাব দিই তিনি করিডরের পাশের সিট বদলে আমাকে জানালার পাশের সিটটি কি দিতে পারবেন? মনে হয় প্রস্তাব দিলে ভদ্রলোক না করবেন না। তবুও প্রস্তাব দিইনি।

গলা লম্বা করে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ট্রেন শায়েস্তাগঞ্জ এসেছে। হকারের কাছ থেকে দুটি ম্যাগাজিন কিনলাম। দেখেশুনে কিনলাম। আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু শিউলির কাছ থেকে শুনেছি ট্রেনে এসব হকাররা

চার পাচ মাস আগের ম্যাগাজিন হাতে রেখে দেয়। বিশেষ করে সিনে ম্যাগাজিনগুলো এবং তারিখ না দেখে কিনলে ঠকতে হয়। কারণ হকাররা প্রথমে পুরনো ম্যাগাজিনগুলো ট্রেন যাত্রীদের হাতে ধরিয়ে দেয়।

আমার পাশের ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

হাসির প্রত্যুত্তরে হাসতে হয়। আমিও হাসলাম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, একা নাকি?

হ্যা সূচকভাবে মাথা ঝাকালাম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, যাবে কোথায়?

প্রথমেই তিনি তুমি করে বলছেন দেখে খারাপ লাগলো। হোক না বয়সে বড় তো কি হয়েছে? উত্তর দিলাম, কুয়াকাটা।

ভদ্রলোকের চোখ সত্যি সত্যি কপালের কাছাকাছি উঠে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, এতোদূর একা যাবে?

বললাম, হ্যা।

তারপর ভদ্রলোক কিছু সময় চুপ করে থাকলেন। সম্ভবত একটি মেয়ের একা এতোদূর যাওয়ার ব্যাপারটি হজম করতে তার কষ্ট হচ্ছিল।

কিছু সময় পর তিনি ওনার কথা বলতে লাগলেন যেন ননস্টপ ক্যাসেট চলছে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। ওনার নাম জাবেদ। তিনি ঢাকা যাচ্ছেন বেশ কিছুদিন বেড়াবেন বলে। ফ্যান্টাসি কিংডম, ভাসানী নভোথিয়েটার এসব দেখবেন। তারপর ফিরে আসবেন। তিনি ওনার ব্যবসা সামাল দিতে দিতে নাকি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ওনার কথা শেষ করে বললেন, তিনি একটা কথা বলবেন, আমি যেন কিছু মনে না করি।

বুঝলাম, *তাহলে বলতে হবে না,* বললেও তিনি কথাটি বলবেন। কিছু বললাম না।

তিুনি জানালেন, আমি যদি রাজি হই তাহলে ঢাকা গিয়ে ওনার সঙ্গে এসব জায়গায় বেড়াতে পারি। তারপর দুজন এক সঙ্গে কুয়াকাটা যাবো।

আমি এ রকম অবাক হইনি জীবনে। এবারই প্রথম। ইচ্ছা হলো হাতের ম্যাগাজিনগুলো ছিড়ে ওনার পায়ের নিচে আগুন জ্বালিয়ে দিই। তাহলে তিনি জ্বলেপুড়ে যাবেন। এবং এতো অভদ্র প্রস্তাব আর কাউকে দিতে পারবেন না।

কিন্তু এ পুরুষ শাসিত সমাজে তো আর তা সম্ভব নয়!

তিনি বললেন, দিনে ঘুরবো, তারপর হোটেলে এক সঙ্গে থাকবো।

জিজ্ঞাসা করলাম, একই রুমে?

তিনি নিচু কণ্ঠে বললেন, হ্যা।

এবং তখনই আমার ডান হাত মুঠি করে বাম দিকে কাত হয়ে ওনার তলপেটের দিকে খুব জোরে ঘুষি মারলাম।

এবার তিনি হতবাক হয়ে বুক ও নাক চেপে ধরলেন। ব্যথা যে পেয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছিল।

যেহেতু বাম দিকে কাত হয়ে ঘটনাটি ঘটিয়েছি, তাই ট্রেনের কারো চোখে সম্ভবত পড়েনি।

নিচু কণ্ঠে বললাম, যা বলেছেন তা যথেষ্ট। এ রকম কথা জীবনে আর কাউকে বলবেন না। বললে ব্লেড দিয়ে আপনার ... কেটে ফেলবো।

কি কেটে ফেলবো তা বললাম না।

এবং যোগ করলাম, আমাকে নিয়ে বেড়াতে হবে না। আপনার মতো ছোটলোকের সঙ্গে বেড়ানোর কোনো ইচ্ছা আমার নেই। আমাকে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য লিটনভাই আছেন।

এরপর থেকে ভদ্রলোক ঢাকা পর্যন্ত আমার দিকে তাকাননি। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন।

জার্নি টু কনিন

- মিলু কাশেম

১৯৮৬ সালের কথা। পূর্ব ইওরোপে তখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রান্তিকাল। আমি তখন যাযাবরের মতো ইওরোপের বিভিন্ন দেশ চষে তৎকালীন পশ্চিম জার্মানির বাসিন্দা।

আগনেস আমার পোলিশ বান্ধবী। তার আমন্ত্রণে কৃসমাস আর নিউ ইয়ারের ছুটি কাটাতে প্রথমবারের মতো ট্রেনে চড়ে গিয়েছিলাম লেস ওয়ালেসার দেশ পোল্যান্ডে। দেশটিতে তখন চলছিল জেনারেল জেরুজালেস্কির স্বৈরশাসন। পশ্চিম জার্মানির ডুইসবোর্গ থেকে পূর্ব জার্মানির ওপর দিয়ে পোল্যান্ডের কনিন পর্যন্ত প্রায় আঠারো ঘণ্টার এই ট্রেন জার্নি ছিল আমার ইওরোপ জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় আর কষ্টকর অভিজ্ঞতা।

ডুইসবোর্গ পশ্চিম জার্মানির নর্থাইন ওয়েস্টফেলিয়া প্রভিন্সের একটি প্রধান নগরী ও রেলওয়ে জাংশন। ইওরোপের প্রায় সব দেশের ট্রেন ডুইসবোর্গ ছুয়ে যায়।

সকাল এগারোটায় পশ্চিম বার্লিনগামী ইন্টারসিটি ট্রেনে চড়লাম। পূর্ব জার্মানির সীমান্ত পেরিয়ে বার্লিন পৌছাতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল।

পশ্চিম বা ওয়েস্ট বার্লিন ছিল পূর্ব জার্মানির ভূ–সীমানায় অবস্থিত পশ্চিম জার্মানির বৃহত্তম নগরী।

তখন এই মহানগরী ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা, বৃটিশ ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত।

রাতে বার্লিন থেকে পোল্যান্ডগামী সুবিধা মতো কোনো ট্রেন পাওয়া গেল না। রেলওয়ে ইনফরমেশন থেকে জানা গেল, প্যারিস থেকে একটি ট্রেন ভোর রাতে বার্লিন পৌছাবে। সেটাই যাত্রা বিরতির পর পূর্ব জার্মানির লিপজিগ ও অন্য কয়েকটি শহর পেরিয়ে পোল্যান্ডের পোজনান কনিন ওয়ারশ হয়ে মস্কো যাবে। আমার জন্য সেটাই সুবিধাজনক ট্রেন।

স্টেশনের লকারে (লেফট লাগেজ) ব্যাগ রেখে কয়েন বক্স থেকে আগনেসকে বিস্তারিত জানিয়ে দিলাম। ম্যাকডোনাল্ডসে রাতের খাবার সেরে একটি ডিসকোতে ঢুকে পড়লাম। ভোর সাড়ে পাচটায় স্টেশনে ফিরে এলাম।

প্ল্যাটফর্মে পূর্ব ইওরোপগামী প্রচুর লোকের ভিড়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্ব–পশ্চিম জার্মানি, পোল্যান্ড ও সভিয়েট রেলওয়ের কম্পার্টমেন্ট সংযুক্ত মস্কোগামী ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলো। ভিড় কম দেখে একটা কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্রেনটি বার্লিন হাফটবানহোফ (সেন্ট্রাল স্টেশন) থেকে ছেড়ে দিয়ে আবার এসে থামলো বার্লিনের শেষ স্থানীয় স্টেশন ফ্রেডরিচ স্ট্রাস–তে।

এটি পূর্ব–পশ্চিম বার্লিনের সীমান্তে অবস্থিত। স্টেশনের অর্ধেক পশ্চিম বা অর্ধেক পূর্ব জার্মানির দখলে। ট্রেন স্টেশনে থামতেই আমার কম্পার্টমেন্টে আমি ছাড়া বাকি সবাই নেমে পড়লো।

সবার নেমে যাওয়া দেখে আমার সন্দেহ হলো। হঠাৎ চোখে পড়লো কম্পার্টমেন্টের এক পাশে লেখা রয়েছে এটার গন্তব্য পশ্চিম বার্লিনের সীমান্ত অর্থাৎ ফ্রেডরিচ স্ট্রাস পর্যন্ত।

এতোক্ষণ এই বগিতে যেসব যাত্রী ছিলেন তাদের সবার গন্তব্য যে এখান পর্যন্ত সেটা বুঝতে আর বাকি রইলো না। তাড়াতাড়ি করে নেমে পড়লাম অন্য বগিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। নেমে দেখি অবাক কাণ্ড। পূর্ব জার্মানির সীমান্ত প্রহরীরা প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝিতে একটা রশি টেনে দাড়িয়ে আছে যাতে তাদের অংশে কেউ না ঢোকে এবং সেই অংশেই দাড়িয়ে আছে ট্রেনের পূর্ব জার্মানি পোল্যান্ড আর মস্কোগামী অংশটুকু। সেদিকে যেতে চাইলে আমাকে তারা যেতে দিল না। বারবার অনুরোধ করে ব্যর্থ হলাম।

স্টেশনের এ অংশের সব যাত্রী চলে গেছে। কেবল আমি দাড়িয়ে আছি অসহায়ের মতো।

এর মধ্যে এক মহিলা সীমান্তরক্ষী হাত ইশারায় আমাকে ডাকলো। পাসপোর্ট, ভিসা ও অন্যান্য কাগজপত্র দেখে ট্রেনটা ছেড়ে দেয়ার মুহূর্তে তাদের সীমানায় দাড়িয়ে থাকা ট্রেনের একটি বগিতে আমাকে উঠিয়ে দিল। এটা ছিল সভিয়েট রেলওয়ের একটি স্লিপিং কার। দরজা-জানালায় পর্দা টানা।

করিডোরে দাড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর একটি বগি থেকে বেরিয়ে এলো সভিয়েট রেলের ইউনিফর্মধারী দৈত্য মার্কা সুসজ্জিত গার্ড। রাশিয়ান ভাষায় কি বললো কিছুই বুঝলাম না। শেষে ইশারায় বোঝালো, এখানে দাড়িয়ে থাকার অনুমতি নেই। এক রকম ধাক্কা দিয়েই সে আমাকে সরে যেতে বললো অন্যদিকে।

ভয়ে পরবর্তী কম্পার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যেতে পারলাম না ট্রেনের যাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের করিডোর জুড়ে শ শ যাত্রী দাড়িয়ে রয়েছে মালপত্র নিয়ে। পা রাখার মতো একটু জায়গা নেই।

দৃশ্যটা দেখে আমাদের দেশের ট্রেন জার্নির কথা মনে পড়ে গেল। পশ্চিম ইওরোপে কোথাও এমন দৃশ্য চোখে পড়েনি। সভিয়েট গার্ডের দৃষ্টির আড়ালে স্লিপিং কারের শেষ মাথায় বাথরুমের সামনে দাড়িয়ে রইলাম। ট্রেনটা পূর্ব জার্মানির ওপর দিয়ে এগিয়ে চলছে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক পর সভিয়েট রেলের সেই দৈত্যমার্কা গার্ড এসে হাজির। আমাকে তার সীমানার মধ্যে দাড়িয়ে থাকতে দেখে গর্জে উঠলো।

সমস্যাটা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

সে শুনতেই চাইলো না। দুটো কম্পার্টমেন্টের সংযোগস্থলে একটা নিরাপত্তাহীন অবস্থায় আমাকে ঠেলে দিয়ে তার দিক থেকে সে দরজাটা লক করে দিল।

কৃসমাসের ছুটির কারণে ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড়। সামনের দিকে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। অসহায় অবস্থায় দাড়িয়ে রইলাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগলো। হাত-পা কাপছে।

আমার অবস্থা বুঝতে পেরে ভিড়ের মধ্যে থেকে অপর পাশের এক পোলিশ দম্পতি এগিয়ে এলেন। তাদের মালপত্র টেনেটুনে আমাকে একটু জায়গা করে দিলেন করিডোরে দাড়ানোর।

ট্রেনে সম্ভবত আমিই একমাত্র এশিয়ান বলে সবার দৃষ্টি তখন আমার দিকে।

দুপুর বারোটার দিকে ট্রেন পোল্যান্ডের সীমান্তবর্তী পূর্ব জার্মান শহর ফ্র্যাংকফুর্ট অডায় এসে থামলো। উল্লেখ্য, জার্মানিতে ফ্রাংকফুর্ট নামে দুটি শহর আছে। একটি পশ্চিম জার্মানির প্রধান নগরী যা ফ্র্যাংকফুর্ট এম (মাইন) নামে পরিচিত।

ট্রেন প্ল্যাটফর্মে থামতেই পূর্ব জার্মান আর পোলিশ ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস কর্মকর্তারা ট্রেনে উঠলেন। চলন্ত ট্রেনে প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করলেন। আমি একমাত্র বিদেশি বলে আমার পাসপোর্টসহ সব জিনিসপত্র তন্ন তন্ন করে দেখা হলো। জার্মান ভাষা জানা থাকায় অসুবিধা হলো না।

অল্প সময়ের মধ্যেই সীমান্ত অতিক্রম করে ট্রেন এসে থামলো পোল্যান্ডের ক্যাথবিচ স্টেশনে।

ইমিগ্রেশন কাস্টমসের লোকজন এখানে নেমে পড়লো। এবার তারা যাবে ফিরতি ট্রেনে ফ্র্যাংকফুর্টের দিকে। এভাবেই যাওয়া-আসার পথে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার ট্রেনের যাত্রা শুরু হলো। এখনো প্রচণ্ড ভিড়। মাঝ পথে কয়েকটি অনির্ধারিত স্টেশনে ট্রেন থেমে পড়লো। কোনো কারণ কেউ বলতে পারে না, আমাদের দেশের মতোই সময়সূচির কোনো ঠিক নেই।

অবশেষে বেলা চারটার দিকে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে ট্রেন পোজনান স্টেশনে এসে পৌছালো। এটি পোল্যান্ডের অন্যতম প্রধান নগরী। ওয়ারশ, গদানস্ক, ব্রেসলাও-র পরেই এর স্থান। আমার গন্তব্যস্থল কনিন, আরো একশ কিলোমিটার দূরে।

করিডোরের অনেক যাত্রী নেমে যাওয়ায় ভিড় একটু কমে গেল। ট্রেন ছাড়তে দেরি হবে জেনে আট নয় ঘণ্টা দাড়িয়ে থাকার পর একটু প্ল্যাটফর্মে নেমে মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নিলাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা জার্নির পর ট্রেন এসে থামলো কনিন স্টেশনে। প্ল্যাটফর্মে ট্রেন থামার আগেই জানালা দিয়ে আগনেসকে খুজতে থাকলাম। কথা অনুযায়ী মা বজেনকা, ছোট বোন মার্গারেট, বাবা সতকোসকি–সহ বন্ধুদের নিয়ে তার স্টেশনে থাকার কথা।

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের এক কোণায় দাড়িয়ে ভিড়ের মাঝে আগনেসকে খুজতে থাকলাম। হঠাৎ দেখা গেল প্ল্যাটফর্মের অপরপ্রান্ত থেকে আমাকে খুজতে খুজতে সে এগিয়ে আসছে এদিকে।

দুষ্টুমি করে একটা বিলসাইনের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

আগনেস ঠিকই দেখে ফেললো। প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে দৌড়ে এগিয়ে আসতে থাকলো, হাতে গোলাপ।

দূর থেকে *মি–ই–ইলু–উ* বলে চিৎকার করে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো।

একে তো আমি একমাত্র বিদেশি যাত্রী, তার উপর আগনেসের চিৎকার আর দৌড়ে আসা দেখে সবাই ওর দিকে তাকাচ্ছিল। পরবর্তী দৃশ্য দেখে সবাই যেন অবাক হয়ে গেল।

ট্রেনটা কনিন স্টেশন ছেড়ে দিল।

আগনেস আমাকে জড়িয়ে দাড়িয়ে আছে।

ট্রেনের জানালা দিয়ে সবার দৃষ্টি আমাদের দিকে। আর আমার চোখের সামনে কেবল ভাসতে থাকলো দৈত্যমার্কা সেই সভিয়েট গার্ডের প্রতিচ্ছবি।

সেই চেহারা এবং সেই ট্রেন জার্নির ভয়ংকর স্মৃতি আজো ভুলতে পারিনি।

আম্বরখানা, সিলেট থেকে

নষ্ট লেখক : নষ্ট সাহিত্য

- মোহাম্মদ কামালউদ্দিন

সময়টা ১৯৯৮ সাল। সারা দেশে বন্যা হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের আশায় বসে আছি। হঠাৎ বন্ধু জুবায়ের এসে তার সঙ্গে ঢাকা বেড়ানোর জন্য অনেক রিকোয়েস্ট করায় আম্মাকে দিয়ে আব্বাকে রাজি করিয়ে ঢাকা যাওয়ার প্রোগ্রাম করি। তবে আমার শর্ত হলো ট্রেনে যেতে হবে। কারণ বাসে চড়লে আমার প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করে এবং বমি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আগস্ট মাসে সোনাইমুড়ি স্টেশন থেকে দুটো টিকেট কেটে ভ্রমণ শুরু করি। যদিও প্রথমে জানানো হয় টিকেট নেই। তারপরেও বন্ধুর বুদ্ধির জোরে এবং উপরি দুটো দশ টাকার নোটের বদৌলতে ভেতর থেকে দুটো টিকেট আনতে পারে।

ট্রেনে চলছি মহা আনন্দে। ট্রেন জার্নির মজাই আলাদা। যদি সঙ্গে কেউ থাকে, বন্ধু হলে তো আর কথাই নেই! মাঝপথে আমার বন্ধুটি প্রকৃতির ঢাকে সাড়া দিতে বাথরুমে যায়। ফিরে এসে শুধুই হাসতে থাকে। হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করতে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, টয়লেটে যা, দেখতে পাবি।

কৌতূহল নিয়ে টয়লেটে গেলাম। কিন্তু তার হাসির উৎস খুজে পেলাম না। বের হতে যাবো, হঠাৎ আমার চোখের সামনে একটা লেখা পড়লো। এদিকে–সেদিক তাকাতে আরো অনেক লেখা দেখলাম। বের হয়ে অন্য টয়লেটেও গেলাম।

দেখলাম লেখার সম্ভার। কোনোটা বেশ সুন্দর হাতের লেখা, কোনোটা পড়া যাচ্ছে আবার কোনোটা পড়তে কষ্ট হচ্ছে, কারো ঠিকানা লেখা, কোথাও কোথাও সুন্দর ছন্দ লেখা ইত্যাদি।

তবে বিশেষ কিছু মানুষ আমাকে আজ কলম ধরতে বাধ্য করেছে।

মেয়েদের নিয়ে, বিশেষত নারীদের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ নিয়ে অশ্লীল বাক্য লেখা ছিল।

বলতে চাই, যে নারীদের নিয়ে এই নষ্ট লেখকরা এতো বিশ্রী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করছেন টয়লেটে সেই নারীদের অঙ্গ দিয়েই আপনার আর আমার দুনিয়াতে আসা।

টয়লেটে লিখে নিজের শিক্ষাকে আগমানিত করবেন না। মনকে সুন্দর করুন, পবিত্র করুন। সব কিছুকে সুন্দরভাবে, ভালোভাবে, পবিত্রভাবে উপভোগ করুন।

রাঙ্গামাটি থেকে

বেইজিং থেকে তিয়ানজিং

- তৌহিদা ফারুক

দশ দিনের ব্যক্তিগত ভ্রমণে চায়নাতে এসেছি। বেইজিংয়ে যে হোটেলে চেকইন করলাম তার থেকে সামান্য দূরেই ইসলামিক রেস্টুরেন্ট। তার মালিক মোহাম্মদ ইসমাইল, যার চায়নিজ নাম হান–শিয়াও–ঝি। ভাঙা ইংরেজিতে আলাপ জমে উঠলো। দূরদেশী মুসলিম ভাইবোনদের সাহায্য করতে তিনি সদা তৎপর। তার কাছ থেকে চায়নিজ ভাষায় নামগুলো লিখিয়ে নিয়ে গ্রেট ওয়াল, ফরবিডেন সিটি, সামার প্যালেস, তিয়েন–আন–মিন স্কোয়ার সব কিছু ঘুরে বেরিয়ে চায়নিজ জনগণের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যপ্রীতি দেখে মুগ্ধ হলাম।

বেইজিংয়ের বিখ্যাত *হংশুয়া* মার্কেট চায়নিজ ভাষায় যার অর্থ লাল সাকো বা বৃজ, সেখানেও দুই বার ঢু মারা হয়ে গেল। বঙ্গবাজারের মতো দরদাম করে জিনিসপত্র কিনতে পেরে সবাই খুব খুশি। মুক্তার বাজারে বিখ্যাত সাউথ সি গার্ল দেখে ও তার দাম শুনে চমকিত হয়ে অষ্টম দিন পর্যন্ত সময় কেটে গেল।

মাত্র দুটো দিন বাকি। তারপর দেশে ফেরার পালা। এ দুটো দিন চায়নিজ জনগণের গ্রামীণ জীবন দেখার ইচ্ছা মনে জাগতেই ইসমাইলের শরণাপন্ন হলাম।

তিনি ট্রেনে করে বেইজিং থেকে তিয়ান জিং পর্যন্ত যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

বেইজিং থেকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এটি একটি প্রাচীন সমুদ্র বন্দর। দ্রুতগতির ট্রেনে যেতে সময় নেবে সোয়া এক ঘণ্টা।

ভাষা না জানা থাকায় সঠিক স্টেশনে কিভাবে চিনে নামবো বললে তিনি তার ভাষায় আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন, এই ট্রেন বেইজিং তিয়ান জিং পর্যন্তই যাতায়াত করে।

পরদিন সকাল আটটায় স্টেশনে পৌছে দেখি প্রধান ভবনের সামনে বিশাল চত্বর। তার দুই পাশে অজস্র যাত্রীবাহী ক্যাব ও অন্যান্য গাড়ির সমারোহ। কিন্তু কোনো ভিড় নেই। যাত্রী নামিয়ে সেকেন্ডের মধ্যেই সেগুলো বিদায় নিচ্ছে। ভেতরে সারি সারি কাউন্টার।

টিকেট কেটে ট্রেন কোন প্ল্যাটফর্মে জানতে চাইলে উপরে যেতে ইশারা করলো। দোতলায় গিয়ে দেখি এলাহী কারবার। একেবারে এয়ারপোর্টের মতো অবস্থা। সিকিউরিটি চেকিং শেষে লবিতে এসে বসতে হলো। নয়টা বিশে ট্রেন। ঠিক নয়টায় আমাদের জন্য নির্ধারিত গেট ওপেন হলো। টিকেট দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে আবার নিচে প্ল্যাটফর্মে নামার পালা। ওখানেই আমাদের ট্রেন দাড়িয়ে আছে।

যদিও বুলেট ট্রেন নয় তবুও বুলেট আকৃতির ইঞ্জিন। প্রশস্ত জানালা। ঝকঝকে চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ট্রেনটি এখনই কারখানা থেকে বের হয়ে যাত্রা শুরু করছে। ঠিক দশ মিনিট আগে দরজা খুলে নারী অ্যাটেনডেন্টরা বেরিয়ে এলো। হাসিমুখে লাইনে দাড়ানো সবার টিকেট চেক করে হাত ধরে ট্রেনে উঠিয়ে দিল।

দোতলা ট্রেনের মেঝে সম্পূর্ণ কার্পেট মোড়া। দুই পাশে চারটা করে সিট। যেকোনো এয়ারলাইন্সকে লজ্জা দিতে পারে ভেতরের এমন সুন্দর ডেকোরেশন!

সামনেই ছোট টেবিল। সেখানে একটা স্টিলের ট্রে রয়েছে। আমরা নাম্বার দেখে দোতলায় উঠে নির্ধারিত সিটে বসলাম। ততোক্ষণে অন্যান্য যাত্রীরাও যার যার সিটে বসেছেন। কোনো গোলমাল, হই চই নেই। পাচ মিনিট পর হালকা একটা বাজনার শব্দ কানে এলো।

বাইরে চোখ রাখতেই দেখলাম ট্রেন চলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে ব্যস্ত শহর পার হয়ে এলো ট্রেন। দুই পাশে এখন কলকারখানা চোখে পড়ছে। ট্রেনের গতি বাড়তে শুরু করেছে। বিশাল সব স্থাপনা চোখে পড়ছে। দুই পাশে রাস্তা। কিন্তু কোনো লেভেল ক্রসিং নেই। কোথাও বা রেল লাইনের উপরে ফ্লাইওভার দিয়ে গাড়ি চলছে। আবার কখনো বা ট্রেন টানেলে ঢুকছে। ট্রেনলাইনের দুইধারে এখন ঘন করে লাগানো গাছের সারি চোখে পড়লো। মাঝে মাঝে ছোট্ট জনপদ চোখে পড়ছে। তবে তার সঙ্গে ব্যারাক জাতীয় ঘরবাড়ির মিলই বেশি। গায়ে গায়ে লাগানো ঘর, মাঝে সরু রাস্তা। কোথাও বা দুই একটা দোকানে নানান ধরনের জিনিসপত্র দেখা গেল। কিন্তু গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা কোথাও দেখা গেল না।

এসব ব্যারাক জাতীয় ছোট ঘরবাড়ি বেশির ভাগ স্থানেই দেখলাম বুলডজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে। সেখানে গড়ে উঠছে পার্ক, ফুলের বাগান। বাকি জমি ফসল ফলানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। একটু দূরে বিশাল সব বহুতল ভবন। অনুমান করলাম, এসব স্থানে উচ্ছেদ করা ঘরবাড়ির অধিবাসীদের পুনর্বাসিত করা হয়েছে। এভাবেই গড়ে উঠছে নতুন চায়না।

বাইরের দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতেই ট্রেনের ভেতরে ইউনিফর্ম পরা একজন স্টুয়ার্ডকে দেখলাম। বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় বোঝাই ট্রলি নিয়ে জিজ্ঞাসা করছে কারো কিছু দরকার আছে কি না।

কফি বলতেই প্যাকেট কেটে টাটকা কফি কাপে ঢেলে গরম পানি দিয়ে চামচসহ ধরিয়ে দিল। দাম দুই ইয়েন অর্থাৎ মাত্র চোদ্দ টাকা। বড় এক মগ কফি, স্বাদেও চমৎকার।

কফি শেষ করে কাপ টেবিলের ট্রেতে নামিয়ে রাখতেই অন্য একটি মেয়ে এসে কাপ তুলে নিয়ে টেবিল মুছে দিয়ে গেল।

তাকিয়ে দেখি অন্যান্য সবাই যার যার পছন্দ মতো পানীয় নিয়েছেন। চায়নিজরা আমাদের মতো দুধ চিনি মিশিয়ে চা খায় না। তাদের পছন্দ প্রধানত গৃন টি (Green Tea)। সবার হাতে সেই জিনিসই দেখলাম। আমরাও পরে খেয়েছি দুধ চিনি ছাড়া সেই গৃন টি। অন্য রকম। তবে চমৎকার স্বাদ।

ট্রেন এগিয়ে চলেছে একশ বিশ কিলোমিটার গতিতে। মৃদু সুরে ঐতিহ্যবাহী চায়নিজ সুর বাজছে। কোনো রকম দুলুনি বা ঝাকুনি নেই। বাইরে তাকিয়ে দেখি প্রকৃতি বদলে গেছে। এখন মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধুই ফসলের ক্ষেত। দূরে ঘন বন। তবে তা মানুষের কুশলী হাতে লাগানো বলে মনে হলো।

হঠাৎ চোখে পড়লো কয়েকজন চাষী কোদাল দিয়ে কি যেন লাগাচ্ছেন জমিতে। সেই টুপি, কালো পাজামা ও খাটো জামা, ঠিক যেমনটি পুরনো সিনেমাতে চোখে পড়ে। একটু পরে দেখলাম গরু দিয়ে একজন লাঙ্গল টানাচ্ছেন। মজাই লাগলো দেখে। আধুনিকতা ও পুরনো পাশাপাশি কাজ করছে।

ক্ষেতের মাঝে বয়ে চলেছে খাল। পানি সেচের জন্য কাটা এই খাল দেখে মনে পড়ে গেল প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় কাটা আমাদের দেশের খালের কথা। ট্রেনলাইনের পাশে লাগানো অজস্র গাছে কোথাও বা ফুল ধরেছে আবার কোথাও শুধুই কুড়ি চোখে পড়লো। তার ওপাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। ক্ষেতের কাছে এসে রাস্তা ফ্লাইওভারে রূপান্তরিত হয়েছে। কোথাও বা দোতলা ফ্লাইওভার। একই সঙ্গে ট্রেন ও গাড়ি চলার জন্য এই ব্যবস্থা। ন্যূনতম ফসলি জমি যেন নষ্ট না হয় সেই কারণে গোটা চায়না জুড়েই গড়ে উঠেছে এ ফ্লাইওভার।

দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের ক্ষেত, চোখ জুড়ানো সবুজ প্রকৃতি আর রাস্তার দুই পাশ জুড়ে রঙিন ফুলের মেলা। ভাবতে অবাক লাগে, মাত্র দুই দশক আগেও সারা চায়নায় ফুলের বদলে সবজির চাষ করা হতো। এমনকি ট্রাফিক আইল্যান্ডেও টমাটো, কপি বা গাজরের চাষ করা হতো দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য। বর্তমানে তারা মাইলের পর মাইল জুড়ে ফুলের বাগান গড়ে তুলেছে।

এসবই সম্ভব হয়েছে কঠোর পরিশ্রমী চায়নিজ জনগণ ও তাদের নেতাদের দূরদর্শিতার জন্য। প্রাচীন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে তারা গড়ে তুলেছে খাদ্য স্বযংসম্পূর্ণ শক্তিশালী অন্য এক চায়নাকে।

প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। আমরা গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়েছি। হঠাৎ ভেড়ার পাল দেখতে পেলাম, সঙ্গে পাহারাদার কুকুরও রয়েছে। মনে হলো কাছাকাছি কোনো ফার্ম রয়েছে। সাইকেলে করে লোকজনকে রাস্তা দিয়ে চলতে দেখা গেল।

ট্রেনের গতি কমে এসেছে।

অ্যাটেনডেন্ট জানালার পর্দা টেনে দিয়ে গেল।

চায়নিজ ভাষায় বহুবিধ ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। লাল স্ক্রনেও ভেসে উঠছে নানান লেখা।

আমরা পড়তে না পারলেও বুঝলাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ট্রেন থেকে বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি নিতে বলছে।

ট্রেন স্টেশনে ঢুকলো। প্লাটফর্মের দুই পাশে অন্যান্য ট্রেন দাড়িয়ে আছে। কোনোটি আন্তঃনগর আর কোনোটি লোকাল ট্রেন। এ দেশের লোকাল ট্রেনের বগিগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের ট্রেনগুলোর বগির মিল খুজে পাওয়া গেল। তবে এখানে লোকাল ট্রেনের সাজসজ্জাও আমাদের দেশের ট্রেনগুলোকে লজ্জা দিতে পারে।

হালকা বাজনার শব্দে বুঝলাম ট্রেনটি থেমে পড়েছে তার গন্তব্যে। সিট ছেড়ে সবাই উঠে দাড়িয়েছে। কিন্তু কোনো হই চই অথবা *কুলি কুলি* চিৎকার নেই। যার যার মাল পত্র নিয়ে লাইন দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দরজার দিকে এগিয়ে চলেছেন।

অ্যাটেনডেন্ট মেয়েটি সবাইকে হাত ধরে এবং বাচ্চাদের কোলে করে নামিয়ে দিচ্ছে। মুখে অনবরত লেগে আছে *শে শে* বা ধন্যবাদ শব্দটি।

আমরাও নেমে পড়লাম।

চায়নার গ্রামীণ জীবন দেখতে চেয়ে দেখতে পেলাম এক পরিশ্রমী জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে। বিশ্বে আজ চায়না যেখানে এসে দাড়িয়েছে তার মূলে রয়েছে এদের দায়িত্ব পরায়ণতা ও শৃঙ্খলা বোধ। সে সঙ্গে সুদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আগাম পরিকল্পনা নিয়ে তাকে বাস্তবায়নের ক্ষমতা।

চায়নিজ ভাষা জানা না থাকায় চায়নায় ভ্রমণ সম্পর্কে যে ভীতি ছিল এই দশ দিনে চায়নিজ জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, ভদ্রতা এবং দায়িত্ব বোধ তা সম্পূর্ণ দূরে করে দিল। যেখানেই সাহায্য চেয়েছি, ইশারায়–ইঙ্গিতে বা কোথাও সঙ্গে করে নিয়ে তারা সে সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

থ্যাংক ইউ চায়না এবং তার পরিশ্রমী মানুষকে।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন
গাজীপুর, ঢাকা থেকে

ভ্রমণসঙ্গী

- মেহনাজ

সিলেট থেকে ফিরছিলাম। একা। এই প্রথম একটা পথ একাকী ভ্রমণের ঝুকি নিলাম। সকাল সাতটায় আন্তঃনগর ট্রেনে চেপে বসলাম। এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমার জন্য এক অ্যাডভেঞ্চারও বটে। যেহেতু একা, তাই সিট পরিবর্তন করে মেয়েদের সঙ্গে বসতে চাইলাম। মেয়ে একজন পেয়েছিলাম। কিন্তু টুরিস্টের সঙ্গে একজন ছেলে। জানলাম ওরা জাপানিজ। অবশ্য চেহারা দেখেও তাই মনে হচ্ছিল।

বাঙালি আরেকজন যাত্রীও ছিল। ছেলে। টুরিস্টরা চাইছিল দুজন পাশাপাশি সিটে বসবে। তাহলে আমাকে আর ওই যাত্রীকে পাশাপাশি বসতে হবে। সেই ছেলেটা আবার জানালার পাশেই বসবে। আমি চাইছিলাম টুরিস্ট মেয়েটার পাশে বসতে। সে কথাটা বোঝাতে ওদের অনেক সময় লাগলো। ওরা বুঝতে পারছিল না কি বলছি। তাই শুধু হোয়াট ইজ দি প্রবলেম। নো প্রবলেম বলে যাচ্ছিল।

কি মুশকিলে পড়লাম! অন্য যাত্রীদের সহায়তায় অবশেষে বোঝাতে পারলাম। কিন্তু জানালার পাশে আর বসা হলো না।

ট্রেন ছুটে চললো গন্তব্যের দিকে। ভাবছিলাম কিভাবে কাটাবো এই দীর্ঘ সময়, সঙ্গে দুজন টুরিস্ট, তাদের সঙ্গে গল্প করা অসম্ভব। বাকি একজন কখনো পত্রিকায় চোখ রাখছে, কখনো জানালার বাইরে দ্রুত চলে যাওয়া দৃশ্য দেখছে, কখনো বা আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে।

এক সময় কথা হলো সেই ছেলেটার সঙ্গে টুকিটাকি। কিছুক্ষণ পরে সে চলে গেল কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই। অনেকক্ষণ পরে এসে সামান্য কথাবার্তা টুরিস্টদের নিয়ে।

সুবিধা হলো, ওরা আমাদের কথা কিছুই বুঝতে পারে না। ওরাও হয়তো আমাদের নিয়েই কথা বলছে, হাসছে, আমরা বুঝতে পারছি না।

আমার বাঙালি সহযাত্রী বললো, ওরা জাপানের সবচেয়ে গরিব। কারণ ওদের বেশভূষা খুব নিম্নের যা আমাদের ফকিররা পরে। তারপরও ওরা কতো ধনী।

তার বলার ভঙ্গিতে ভীষণ হাসি পেল।

ট্রেন থামছে বিভিন্ন স্টেশনে। ফেরিওয়ালা ফেরি করে বেড়াচ্ছে। কয়েকজন ফেরিওয়ালা ওদের কাছে এলো আনারস, কলা, বাদাম ইত্যাদি নিয়ে। ওরা বেশ মজা পাচ্ছে আর নো (no) নো (no) বলছে। ফেরিওয়ালাগুলোও বদ। ওদের বিরক্ত করছে।

একজন পাখাওয়ালা এসে টুরিস্ট ছেলেটার মাথায় বাতাস দিচ্ছে আর বলছে, নেন স্যার। ছেলেটা যতোই নো (no) বলছে, পাখাওয়ালা ততোই জোরে বাতাস দিচ্ছে আর বলছে, নেন স্যার। গরম তো, আপনার লম্বা চুলে বাতাস দেবেন, ঠাণ্ডা লাগবে।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

ওরা তো কিছুই বুঝলো না। কে যেন বলে উঠলো, *বুশের দ্যাশের, বাইন্দা রাখ*।

তখন চলছিল ইরাকে যুদ্ধ। বুশ বলায় কি বুঝলো জানি না, শুনলাম ওরাও বুশ নিয়ে কথা বলছে। এভাবেই কাটছিল সময়। আমার সহযাত্রী সুমন আবার চলে গেল অন্য বগিতে।

অনেকক্ষণ আমি একা। ভালো লাগছিল না। অদ্ভুত ব্যাপার, আমি অপেক্ষা করছি সুমনের। কেন করছি জানি না। অথচ আসার পরেও আবার কিছুটা অস্বস্তি ফিল করলাম। কারণ হঠাৎই বলে দিলাম, কোথায় ছিলেন এতোক্ষণ? বলাটা ছিল ভীষণ অভিমানের।

এরই মধ্যে লাঞ্চের সময় হলো। একটি স্টেশনে থামলো ট্রেন।

নামলাম। একটা হোটেলে ঢুকে পুরি খেলাম। বিল আমাকে দিতে দিল না সুমন। কলা কিনলো তার বাসার জন্য। আমাকেও কিনে দিতে চাইলো।

ভিড় ঠেলে ট্রেনে উঠছি, এমন সময় আমার নাম জানতে চাইলো।

বললাম, ট্রেনে উঠে বলবো। পরিচয়ের পর্বটা শুরু হয় নাম দিয়ে, অথচ আমরা এতোটা পথ এলাম, কতো কথা হলো, তবু নাম জানা হয়নি।

ট্রেন ছেড়ে দিল। সুমন নাম জানতে চাইলো, তার নামও তখন জানলাম। শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। টুরিস্টদের কলা খেতে দিল। প্রথমে ওরা নিতে চায়নি, পরে নিল।

এরই মাঝে টুরিস্ট দুজনের মধ্যে সামান্য কথা কাটাকাটি হলো। সম্ভবত ছবি তোলা নিয়ে। ট্রেন এতো দ্রুত ছুটছে যে ওরা ছবি তুলতে পারছে না। দুজনেরই মুখ থমথমে। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য ঠিক হয়ে গেল।

সুমন অনেক্ষণ ছিল না, টুরিস্ট মেয়েটা হয়তো ভেবেছে সুমন নেমে গেছে। তাই সুমনের সিটে মেয়েটা চলে গেল।

আমি মেয়েটার সিটে বসলাম। জানালার পাশে বসতে পারলাম এতোক্ষণে।

সুমন ফিরে এসে দেখলো তার সিট খালি নেই। তাই আমার পাশে বসলো। বললো, ভেবেছিলাম সিট খালিই থাকবে। কারণ ওরা বেশ নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে।

ওদের পক্ষ নিয়ে বললাম, হয়তো ভেবেছে আপনি চলে গেছেন।

সুমন আবারও কোল্ড ড্রিংকস কিনলো।

বললাম, এবারের বিলটা অন্তত আমি দিই।

নিতে চাইলো না। বললো, আবার যখন দেখা হবে তখন সব বিল আপনি দেবেন। দেখা কি হবে? বললাম। হতেও তো পারে।

অগত্যা তাই মেনে নিতে হলো। জানলাম আমেরিকা কর্তৃক ইরাক আক্রমণের পর সুমন বিদেশি দ্রব্য বর্জন করেছে। ওর প্রতিজ্ঞা ছিল আর কখনো আমেরিকার কোনো জিনিস ব্যবহার করবে না। অথচ তখন আমার জন্য নামি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলো, কোল্ড ড্রিংকস খেলো। মনে মনে ভাবলাম, যে শুরুতে জানালার সিটটা পর্যন্ত ছাড়তে ছায়নি, অথচ এখন তার প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ করছে।

এরপর আরো অনেক গল্পে সময় ভালোই কেটে যেতে লাগলো। এয়ারপোর্ট স্টেশনে নেমে যাবো আর বেশি সময় নেই। সুমনের মোবাইল থেকে আপাকে জানালাম চলে আসছি।

আমার ফোন ইনডেক্সে সুমন তার মোবাইল নাম্বার লিখে দিল। সেও সেভ করে রাখলো আপার নাম্বার।

বিদায়ের কথা হলো। ট্রেন থেকে নামার সময় আমার ব্যাগ নামিয়ে দিল। এরপর আমরা আলাদা হয়ে গেলাম।

চমৎকার এক ট্রেন ভ্রমণ হলো আমার। যখন শুরু করেছিলাম তখন ভাবিনি এমন চমৎকার কাটবে আমার একাকী ভ্রমণ। ভ্রমণসঙ্গী যদি ভালো না হয় তবে ভ্রমণটাই বৃথা। আমরা ট্রেনের বগিতে পরিচয়ের মতো স্টেশন থেকেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইনি।

মোবাইলে আমাদের যোগাযোগ ছিল অনেক দিন। এরপর হঠাৎই আমরা যোগাযোগ বন্ধ করলাম। কেন তা জানা হয়নি।

আমার কাছে ট্রেন ভ্রমণ মানেই সুমন আর সেই টুরিস্ট দুজন। আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে সেই ভ্রমণ কাহিনী। ইচ্ছে করলেই সুমনকে ফোন করতে পারি। কিন্তু করি না। ভাবি, থাক না সে একটা স্মৃতি হয়ে।

দক্ষিণ আলেকান্দা, বরিশাল থেকে

ট্রেনের সাতকাহন

- আনোয়ার সাদাত শিমুল

ইস্টিশানের রেলগাড়িটা
মাইপা চলে ঘড়ির কাটা
প্ল্যাটফর্মে বইসা ভাবি
কখন বাজে বারটা
কখন বাজে বারটা।

নয়টার ট্রেন কয়টায় ছাড়ে অবস্থায় কারো আবার সত্যি সত্যিই বারোটা বেজে যায়। তবুও ট্রেন আসে–যায়, ছুটে চলে আপন গন্তব্যে। যাত্রীদের মাঝে ঘটে কিছু ঘটনা। যার কোনোটা আনন্দের, কোনোটা বেদনার আর কোনোটা বিব্রতকর অবস্থার।

নয়টার ট্রেন কয়টায় ছাড়ে

ট্রেন ছাড়ার কথা সকাল নয়টায়। অথচ কোনো খবর নেই। ঘড়ির কাটায় বারোটা পার। অপেক্ষমাণ যাত্রীরা অস্থির। একজন সাহসী যাত্রী বিরক্তি নিয়ে স্টেশন মাস্টারের রুমে গিয়ে রেগে যায়।

ট্রেন যদি সময় মতো না-ই ছাড়ে তাহলে এ ট্রেন ছাড়ার সময়সূচি কাগজটা ঝুলিয়ে রাখেন কেন?

ওটা যদি না ঝোলাতাম তাহলে বুঝতেন কিভাবে যে, এটা নয়টার ট্রেন? স্টেশন মাস্টারের বুদ্ধিদীপ্ত জবাব।

সাহসী যাত্রী থতমত।

বিনা টিকেটে ট্রেনে চড়া

একবার এক সম্মেলনে যোগ দিতে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে তিনজন আরব এবং তিনজন ইসরেলি। আরবরা প্রত্যেকে একটি করে তিনটি টিকেট কিনলো। অথচ তারা দেখলো ইসরেলি তিনজন কিনলো মাত্র একটি টিকেট।

তোমরা তিনজন এক টিকেটে কিভাবে যাবে? এক আরব জিজ্ঞাসা করলো।

জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি। এক ইসরেলি জবাব দেয়।

সব যাত্রী ট্রেনে উঠলো। আরবরা যার যার নির্দিষ্ট আসনে বসলো।

আর তিনজন ইসরেলি ট্রেনের টয়লেটের ভেতরে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ থাকলো।

ট্রেন ছাড়লো।

একটু পর টিকেট চেকার সবার টিকেট চেক শুরু করলো।

টয়লেটের দরজায় গিয়ে টোকা দিয়ে বললো, টিকেট প্লিজ।

দরজা একটু ফাক করে একজন ইসরেলি সেই টিকেটটি বের করলো। চেকার টিকেট নিয়ে চলে গেল।

তারপর তিন ইসরেলি বের হয়ে খালি তিনটি সিটে গিয়ে বসে পড়ে।

ইসরেলিদের বুদ্ধি দেখে আরবরা খুব অবাক হলো। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, সম্মেলন থেকে ফেরার সময় তারাও একটি মাত্র টিকেট কিনবে এবং ইসরেলিদের মতো *টয়লেট টেকনিক* ফলো করবে।

প্ল্যান মতো ফেরার সময় তারা একটি টিকেট কিনে। কিন্তু এবার আরবরা আরো অবাক হয় যখন দেখে ইসরেলিরা একটিও টিকেট কিনলো না।

তোমরা টিকেট ছাড়া কিভাবে যাবে? এক আরব জিজ্ঞাসা করে।

জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড সি। এক ইসরেলি জবাব দেয়।

যাত্রীরা সবাই ট্রেনে ওঠে। আরব তিনজন এবার এক টয়লেটে ঢোকে। আর তাদের অনুসরণ করে ঠিক পাশের টয়লেটে ঢোকে ইসরেলি তিনজন।

ট্রেন চালু হয়।

একটু পরে এক ইসরেলি টয়লেট থেকে বের হয়ে আসে। আরবদের টয়লেটে টোকা দিয়ে বলে, টিকেট প্লিজ। একজন আরব তাদের টিকেটটি বের করে দেয়। আর ওই ইসরেলি টিকেটটি নিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ে নিজেদের টয়লেটে, বাকি দুজনের সঙ্গে।

তারপর...!

দার্শনিকের ট্রেন ভ্রমণ

ড. ল্যারি স্টিফেন একজন নামকরা দার্শনিক। একবার তিনি সিডনি থেকে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন ছুলছে। টিকেট চেকার এলো। কিন্তু ব্যাগ, পকেট, মানিব্যাগ সব খোজাখুজি করেও তিনি নিজের টিকেট পেলেন না। চেকারকে ডেকে বললেন, বিশ্বাস করো, আমি টিকেট কিনেছি। আমার স্ত্রী নিজে টিকেট কিনে আমাকে ট্রেনে তুলে দিয়েছে।

চেকার স্মিত হাসি দিয়ে বললো, চিন্তা করবেন না স্যার। আমি আপনাকে চিনি। আপনি নামকরা দার্শনিক স্টিফেন। আপনি টিকেট ছাড়া ট্রেনে চড়ার লোক নন।

স্টিফেনের কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠলো, না, না। টিকেট না পেলে আমার খুব অসুবিধা হবে।

কেন স্যার? চেকার জিজ্ঞাসা করে।

আমি কোথায় নামবো সেটা যে ওই টিকেটে লেখা আছে ভাই। স্টিফেনের বিষণ্ন জবাব।

ভালো লাগা ভালোবাসা

ট্রেনে পথ চলতে গিয়ে পাশাপাশি বা মুখোমুখি বসে স্বল্প পরিচয়ে অনেকেই নতুন নুতন সম্পর্ক গড়েছেন। কেউ কেউ ট্রেনে প্রিয়জনকে শেষ বিদায় দিয়ে বিরহ যাতনায় ভুগেছেন। রবিঠাকুরের *হঠাৎ দেখা*-র মতো কারো কারো আবার ট্রেনে দেখা হয় অনেক বছর পর। অসংখ্য নাটক সিনেমা তৈরি হয়েছে যেখানে নায়ক-নায়িকার প্রথম দেখা হয় ট্রেনে। সত্যজিৎ রায় সেই যে কবে দূরত্ব সৃষ্টি বোঝাতে ট্রেন দেখালেন তা এখনো ফলো করেন আমাদের অনেক নির্মাতা। সিনেমায় অভিমানী নায়িকা আত্মহত্যার জন্য রেল লাইন ধরে দৌড়াচ্ছে, বিপরীত দিক থেকে ট্রেন ছুটে আসছে, শেষ মুহূর্তে নায়ক এসে লাফ দিয়ে নায়িকাকে বাচায়। এভাবেও শুরু হয় অনেক কাহিনী। এছাড়াও নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ।

দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা বন্ধু চিরকাল

রেললাইন বহে সমান্তরাল।

এই ধরনের গানও খুব কমন।

আমার বন্ধু হিমেল সিলেট থেকে ঢাকা আসছিল ট্রেনে একা। সারা পথ চুপচাপ বোরিংভাবে কাটালো। কমলাপুরে ট্রেন থামার পর যখন সে সিট থেকে উঠে দাড়ায় তখন দেখে তার পেছনের সিট থেকে নামছে মলি। সারাপথ পিঠাপিঠি জার্নি করেও হিমেল টের পেল না তার স্বপ্নকন্যার উপস্থিতি। হিমেল এখন ট্রেনে উঠেই দেখে নেয় তার পিঠাপিঠি আসনে কে বসলো।

আমাদের আরেক বন্ধু তার নায়িকার প্রথম দেখা পেয়েছিল ভাগ্নেকে নিয়ে শিশু পার্কের ট্রেনে চড়তে গিয়ে। নায়িকা এসেছিলেন তার ভাগ্নিকে নিয়ে!

টানেলে কিছুক্ষণ

বিদেশে রেলপথে বেশ কিছু টানেল আছে। অন্ধকার টানেলে প্রবেশ করলে ট্রেনের যাত্রীরা বেশ শিহরিত হয়। কেউ গান গায়, কেউ চিৎকার করে আর যুগলরা আরো কাছাকাছি চলে আসে ওই অল্প সময়ের জন্য...।

ফ্রান্সের এক লোকাল ট্রেনের একই কম্পার্টমেন্টে যাচ্ছে আমেরিকান হ্যারিস, বৃটিশ জ্যাকি আর ফ্যান্সের অপরূপা শৈলি। ট্রেন হঠাৎ টানেলে প্রবেশ করলো। পুরনো দিনের ট্রেন হওয়ায় কম্পার্টমেন্টের লাইট জ্বলছিল না। টানেলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের কম্পার্টমেন্টে হঠাৎ একটি কিস ও একটি চড়ের শব্দ। টানেল পার হয়ে ট্রেন যখন আলোয় এলো তখন দেখা গেল হ্যারিসের ডান গালে পাচ আঙুলের লাল ছাপ, চোখে জল টলমল। তিনজনই চুপচাপ। কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়।

হ্যারিস মনে মনে ভাবে জ্যাকি বোধহয় শেলিকে কিস করেছে। তাই শেলি অন্ধকারে ভুলে হ্যারিসকে চড় মেরেছে।

শেলি মনে মনে ভাবে, হ্যারিস বোধহয় ভুলে জ্যাকিকে কিস করেছে। সে জন্যই জ্যাকি হ্যাসিরকে চড় মেরেছে।

জ্যাকি মনে মনে ভাবে, আহ! সামনে যদি আরেকটা টানেল পাই তবে আবারো কিস-এর শব্দ করবো আর হ্যারিসকে চড় দেবো। এবার বাম গালে, আরো জোরে!

পাপের ফল

আমার স্কুল জীবনের বন্ধু নাজিম। রেললাইনের পাশে বাড়ি হওয়াতে অবসর সময়টা সে প্রায়ই রেললাইনের আশপাশে কাটাতো। আড্ডা দিতো। তার খুব পছন্দের একটি কাজ ছিল, চলন্ত ট্রেনে পাথর মারা। তার পাথর ছোড়ার ভঙ্গি দেখে জানালার পাশের যাত্রীরা আতংকিত হতো। আর নাজিম খুব মজা পেতো। কারো নিষেধই সে শুনতো না।

একবার বিএনসিসি ক্যাম্পিং শেষে প্রায় দশ দিন পর স্কুলে ফিরলো নাজিম। তার কপালে দেখি ব্যান্ডেজ।

কি হয়েছে দোস্ত? আমরা জিজ্ঞাসা করি।

আর বলিস না। নিজের পাপের ফল নিজে ভোগ করছি। করুণ মুখে নাজিমের জবাব।

বিস্তারিত হলো – ক্যাম্পিং শেষে ঢাকা থেকে ট্রেনে ফেরার সময় ট্রেনের জানালায় বসেছিল সে। আখাউড়ার ওদিকে কোনো এক ফাজিল ছেলে নাজিমের গায়ে পাথর ছুড়ে মারে। কপালে খুব চোট লেগেছে। একটুর জন্য চোখে লাগেনি।

যেমন কর্ম তেমন ফল। আমি খোচা দিই ভাই, তোরা দেখ, এই কান ধরলাম। আর জীবনে পাথর ছুড়বো না ট্রেনে।

সুতরাং আসুন...।

একটি খেলা

রেল তৈরির অন্যতম একটি উপকরণ *লোহা*।

প্রিয় পাঠক, চেষ্টা করে দেখুন তো *লোহার রেল, লোহার রেল* শব্দগুলো শুদ্ধ উচ্চারণে ঘন ঘন দ্রুত সর্বোচ্চ কতোবার বলতে পারেন।

ঢাকা থেকে
shimul2441139@yahoo.com

অসহায়

জাহাঙ্গীর আলী

অসুস্থ গিন্নিকে নিয়ে যাচ্ছি। ফার্স্ট ক্লাস বগিতে উঠতে গিয়ে দেখি বড় বড় বস্তায় রুমটি ঠাসা। বসা তো দূরে কথা, ওঠারই জো নেই।

রেলওয়ে আইনে ফার্স্ট ক্লাস যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা করে দিতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য।

গার্ডের কাছে ব্যাপারটি জানালে কোনো বাক্য ব্যয় না করে ভদ্রলোক সোজা টিটিকে দেখিয়ে দিলেন।

টিটিকে টিকেট দেখিয়ে বসার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানালে অবাক বিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাকানোর ভাবসাবে মনে হলো, আমার মতো বোকার হদ্দ বোধহয় আগে আর কখনো দেখেননি।

মুখে একটা কেমন যেন হাসির ঢেউ তুলে কপালের রেখা কুঞ্চিত করে বললেন, টিকেট কেটেছেন কেন?

তার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে অপরাধীর মতো বললাম, অন্যায় করে ফেলেছি বুঝি!

টিটি মশাই কথার কোনো জবাব না দিয়ে সোজা হাটা দিলেন।

অগত্যা ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট পকেটে রেখে সেকেন্ড ক্লাসের বগির চিপার মধ্যে কোনোমতে একটু ঠাই নিয়ে গন্তব্যে পৌছাতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে ট্রেনের বাদশাহ ওই টিটিকে দেখেছিলাম সারাক্ষণই বিনা টিকেটের

যাত্রীদের সঙ্গে হাসিমুখে করমর্দন করছেন আর নিজ পকেটে হাত ঢোকাচ্ছেন। সেদিন টের পেয়েছিলাম স্বাধীন দেশে টিকেট কেটে ট্রেনে চড়ার স্বাদ কাকে বলে!

তবে ১৯৯৯ সালে ইনডিয়া গিয়ে এদের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। বাংলাদেশ আর ইনডিয়ার মধ্যে মাত্র সামান্য কয়েক মাইলের ব্যবধানে কি অভুতপূর্ব উন্নতিই না তারা করেছে! সত্যি তারিফ করার মতো। অবশ্য দূরপ্রাচ্যে যাবার সৌভাগ্য এখনো হয়নি। তবে ছেলের কাছে ইওরোপ-আমেরিকার ট্রেনের কথা অনেক শুনেছি। ইনডিয়ায় গিয়ে সে কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল।

ট্রেনে ভিখারি, হকার, ফেরিওয়ালার উৎপাত, জ্বালাতন নেই। ইচ্ছামতো ট্রেন থামিয়ে রেখে গার্ড, চেকারদের গালগল্প নেই। *নটার ট্রেন কটায়* এমন প্রবাদও অচল সেখানে। আর বিনা টিকেট! এটা তো চিন্তাই করতে পারে না ওরা।

রিজার্ভ করে রাখা *রাজধানী এক্সপ্রেস*-এর আরামদায়ক সিটে হাত-পা ছড়িয়ে লম্বা হয়ে ক্লান্তি বিহীন ভ্রমণ সত্যি মনে রাখার মতো। হাওড়া থেকে সেই সুদূর দিল্লি। এতো সুন্দর নিরাপদ ব্যবস্থা সত্যি অচিন্তনীয়। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাজার হাজার মাইল ছোটাছুটি করছে সারা ইনডিয়া জুড়ে এমনি অসংখ্য ট্রেন।

পাতাল ট্রেন! মানে *মেট্রো*। এটা তো আরেক বিস্ময়। ধারণায় আসে না আমাদেরই মতো তৃতীয় বিশ্বেরই উন্নয়নকামী দেশ এটা! ইওরোপ অথবা আমেরিকার কোনো রাজ্য বলে ভ্রম হয়।

তবে ফেরার পথে সৌন্দর্যহানিকর কিছু শুয়ো পোকার দৌরাত্ম চোখে পড়েছিল। সে অভিজ্ঞতা কখনো ভোলার নয়।

পরিশেষে ফেরার পালা। দিল্লির সুবিশাল পুরনো রেলস্টেশনে কলকাতার রিজার্ভেশন টিকেট চাইলে, কাউন্টারের আধুনিক অবাঙালি মহিলাটি রাঙা ঠোটের হিল্লোল তুলে চটপট জানিয়ে দিলেন, *কোই টিকেট নেহি হ্যায়*।

সাহসে ভর করে অতি নযম গলায় দ্বিতীয়বার অনুরোধ জানালে কমপিউটারটা একটু টেপাটেপি, নাড়াচাড়া করে বিরক্তির স্বরে বললেন, *সরি, সাত দিনকা অ্যাডভান্স টিকেট খতম হো চুকি*।

এরপর তো আর কথা চলে না। হঠাৎ পাশের দেয়ালে চোখ পড়তেই দেখি বিরাট বোর্ডে বিদেশিদের জন্য আলাদা কোটা ব্যবস্থা লেখা রয়েছে। তাই হাসিমুখে আবারও সেই কাউন্টারবাসিনীকে বিদেশি কোটার উল্লেখ করতেই একরাশ বিরক্তি নিয়ে ইংরেজিতে জানতে চাইলেন, *হুইচ কান্ট্রি ইউ কাম ফ্রম?*

মহাখুশিতে এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে ত্বরিত জবাব দিলাম, *বাংলাদেশ*।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি আজব কিছু দেখার মতো মুখ ভঙ্গি করে ঠোটটা উল্টিয়ে টেনে টেনে বললেন, *ও - বাংলাদেশ* ! তারপর মুখটা এমনভাবে বাকা করে রইলেন যেন ঘৃণিত কোনো জীব দেখে অপবিত্র হয়ে গেছেন।

এ অবস্থায় রাগে সারা শরীর রি রি তোলপাড় করলেও এখানে একেবারে অসহায়। এতো দিন ধরে শুনে আসছি ইনডিয়া আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু, ভাতৃপ্রতিম, নিকট প্রতিবেশী, মুক্তিযুদ্ধের সহযোদ্ধা, তৃতীয় বিশ্বের অগ্রদূত। তাহলে এসব সব বানোয়াট, মিথ্যে, ধাপ্পাবাজি! শুধু কথার কথা। ইনডিয়ায় না গেলে কখনো হয়তো জানতেই পারতাম না। ওই ব্রাহ্মণদের কাছে কতো ঘৃণিত অচ্ছুৎ আমরা।

লজ্জা, অপমান, একরাশ ক্ষোভ বুকে নিয়ে কাউন্টার থেকে ফিরে নিজের মনেই গজ গজ করছি আর কি করা যায় ভাবছি। ঠিক এমনি সময়ে টাই-কোট পরা সুবেশধারী পক্ককেশের লম্বা-চওড়া এক প্রবীণ ব্যক্তি কাছে এসে অতি বিনীত কণ্ঠে মার্জিত ভাষায় জানতে চাইলেন, *কেতনা টিকেট কা জরুরাত ?*

মর্যাদাপূর্ণ চেহারা, বেশভূষায় মনে হলো রেলওয়ের কোনো কর্মকর্তা হয়তো বা। আমাদের অসহায়ত্ব বুঝতে পেরে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন।

ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে থেকে আবারও জানতে চাইলেন, *বাতাইয়ে কিতনা টিকেট কা জুরুরাত হ্যায় ?*

তার কথায় কিছুটা আশ্চর্য হয়ে আমতা আমতা করে জানালাম, *কলকাত্তাকা টিকেট জরুরাত হ্যায়।*

নির্বিকার গলায় আশ্বাস দিয়ে বললেন, *হ্যা হ্যা, মিল জায়েগা। বাতাইয়ে কিতনা টিকেট কা জরুরাত।*

ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে এতোক্ষণের জমে থাকা ক্ষোভ–রাগ নিমেষে সব যেন মিলিয়ে গেল। অযথাই ইনডিয়া রেল বিভাগের গুষ্ঠি উদ্ধার করার জন্য মনে মনে লজ্জিত হলাম। আসলেই এরা মহান। সেবাদানকারী ভালো মানুষ। নইলে উপকার করার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এভাবে এগিয়ে আসবে কেন?

বিগলিত কণ্ঠে প্রয়োজনীয় টিকেটের কথা জানালাম।

ভদ্রলোক পকেটে থেকে ঝটপট ক্যালকুলেটর বের করে টিপে টেপে হিসাব করে বললেন, *ইতনা রুপিয়া লাগে গা।*

টাকার কথা শুনে তার মুখের দিকে চাইতেই ধীর গতিতে বুঝিয়ে বললেন, *আপকা টিকেট কে লিয়ে ইতনা, আওর পার টিকেট কে লিয়ে একস্ট্রা একশ রুপি কারকে জিয়াদা ইতনা।*

সুবেশধারীর মোলায়েম তাকের মিষ্টি বাত শুনে একেবারে থ! বলে কি! এ যে সত্যিকারের হীরক রাজার দেশ দেখছি! তাহলে এ মুখোশধারী একটা বড় দালাল! রেলের কাউন্টারের পাশে ওৎপেতে থাকা মক্কেল ধরা চক্র। যোগসাজশের ব্যবসা। কাউন্টারে বসে শুধু লোক দেখানো কমপিউটার টেপাটেপি।

হায় আল্লাহ! এ কোন মগের মুল্লুকে এসে পড়লাম। ঈদ মরসুমে আমাদের দেশে সামান্য কয়দিন এ অবস্থা ঘটে। কিন্তু সারা ইনডিয়া জুড়ে সব সময়ই এদের ঈদ মরসুমে। প্রতি স্টেশনে এদের রমরমা এ অবৈধ ব্যবসা। এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো রাস্তাই নেই। অন্যান্য বিদেশি পর্যটকদের কি অবস্থা জানি না। তবে আমাদের মতো *আবদুল* বাংলাদেশিরা এদের কাছে সত্যিই অসহায়। বিদেশি তো দূরের কথা, তৃতীয় শ্রেণীর কোনো প্রদেশেরও অনেক নিচে আমরা অচ্ছুৎ, অভাজন ছাড়া কিছু নই। ইনডিয়া ভ্রমণে না গেলে কোনোদিনও তা জানতে পেতাম না।

হাতেমখান, রাজশাহী থেকে

চৌত্রিশ বছর আগে

- মোবারক হোসেন

কোনো কৌতূহল বা ভ্রমণের জন্য নয়, কিশোরকালে বাধ্য হয়ে প্রায়ই অনলকে ট্রেনে চড়েতে হতো। ট্রেন যাত্রায় অনলের অভিজ্ঞতা তিক্ততায় ভরা। সুখকর স্মৃতি প্রায় নেই বললেই চলে।

ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত যাত্রী, রাতে বগিতে আলোহীন, বসার স্থানগুলো নোংরা, ঝড়– বৃষ্টি–শীতে জানালার কাচ ওঠে না, টয়লেট দুর্গন্ধময়, ব্যবহারের উপযোগী নয়। পানি নেই, ধান, চাল, আটা, মরিচের বস্তা, লাকরি বোঝাই। যাত্রী বগিতে হাস–মুরগি, ছাগল, শাক–সবজি, চেচামেচি, হকারদের চিৎকার, ক্যানভাসারদের ঠেলাঠেলি ইত্যাদি হাজারো রকমের উৎপাত, তিক্ততার মাঝে আরো একটি বড় বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা জড়িয়ে আছে অনলের জীবনে যা গত চৌত্রিশ বছরেও স্মৃতির পটে ধূসর হয়নি।

অনলের স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে ঢাকা শহরে। গ্রামের বাড়ি গাজীপুর জেলা সদর থেকে দশ এগারো মাইল দূরে। কিশোর বয়সে এতোটা পথ পায়ে হেটে পাড়ি দেয়া খুবই কষ্টসাধ্য। তাই তৎকালীন জয়দেবপুর বাজারে না এসে জয়দেবপুরের পরবর্তী স্টেশন গাজীপুর দিয়ে যাতায়াত করতো। রাজেন্দ্রপুর ও ভাওয়াল জয়দেবপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্তী স্টেশন গাজীপুর থেকে অনলের জন্মস্থান প্রহলাদপুরের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম।

গাজীপুর ষ্টেশনে মেল বা দ্রুতগামী ট্রেনগুলো থামে না। শুধু লোকাল ট্রেন থামে। অনল কমলাপুর থেকে লোকাল ট্রেনে গাজীপুর যেতো। সেখান থেকে পায়ে হেটে মাঠ, ঘাট, নদী, বন, বাগান, বিল পাড়ি দিয়ে বাড়ি পৌছাতো।

বাড়ি থেকে ঢাকা আসার পথেও একই পন্থা অবলম্বন করতে হতো। তবে ট্রেন খুব বিলম্ব বা লেট করলে অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরি পর্যন্ত হেটে এসে বাসযোগে ঢাকা আসতে হতো।

১৯৭১ সালের আগস্ট মাস। অনল ক্লাস নাইনের ছাত্র। চিকিৎসার কারণে সে একাই ঢাকা যাচ্ছে। অন্য সময় হলে কেউ না কেউ সঙ্গে থাকতো। যুদ্ধের সময় বলেই সহজে কেউ শহরমুখী হয় না। গাজীপুর শহরের রাজবাড়ীতে সেনানিবাস। অর্ডিনান্স ফ্যাক্টরিতে অস্ত্রের ডিপো। দুই স্থানেই পাকসেনাদের খুব কড়াকড়ি পাহারা।

ট্রেন ধরার উদ্দেশ্যে গাজীপুর স্টেশন ঘর থেকে অল্প দূরে গাছ তলায়, গাছের আড়ালে দাড়িয়ে অপেক্ষা করছে অনল। দুই একটি ছিন্নমূল গরিব দরিদ্র লোক ছাড়া জনহীন স্টেশন প্রচণ্ড রৌদ্রে খা খা করছে। অদূরে স্টেশনের দক্ষিণ–উত্তর দুদিকেই রেলবৃজে সেনাবাহিনী, রাজাকারদের পাহারা।

তারা মাঝে মধ্যে স্টেশনের দিকে উকিঝুকি দেয়। তাই আড়ালে দাড়িয়ে থাকাটাই নিরাপদ। ট্রেন আসার ঠিক পূর্বক্ষণে আড়াল থেকে বের হয়ে টিকেট কেটে ট্রেনে চড়ে অনল।

প্রায় প্রতিটি বগিই লোকশূন্য। অনল যে বগিতে চড়ে সেখানে কয়েকজন যাত্রী আছে। সকল যাত্রীই চুপচাপ। চানাচুর ভাজা, সর্বরোগের মহা ওষুধ শ্রীপুরের বড়ি, মুড়ি, চিনাবাদাম, আনারস, সিদ্ধ ডিম, কলা বিক্রেতা, হকারদের কোনো উৎপাত নেই।

সামনের সিটে বা বেঞ্চে বসে আছে একটি দম্পতি। বোরখা ঢাকা মহিলার কোল জুড়ে ফুটফুটে শিশু। সঙ্গের জন সম্ভবত স্বামী। বয়স ত্রিশ পয়ত্রিশ হবে। ওনারা কথা বলছেন খুব আস্তে আস্তে যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

জয়দেবপুর, ধীরাশ্রম, টংগি, কর্মিটোলা স্টেশন হয়ে ট্রেন তেজগাও এসে থেমেছে। যাত্রী বলতে পূর্বের কয়েকজনই।

তেজগাও স্টেশনে প্রতি বগিতে চেক করে তন্ন তন্ন করে মুক্তি খোজা হয়। আজও সেই রুটিন কার্যকর করা হচ্ছে। কালো আলখেল্লা পরিহিত কয়েকটি যুবক বয়সী রাজাকার বিহারী অনলদের বগিতে উঠে শরীর, ব্যাগ ইত্যাদি চেক করে দেখছে।

নিজেদের মধ্যে হাসি, ঠাট্টা, তামাশা চলছে উচ্চ স্বরে। অনল রাজাকারদের চোখে চোখ রাখছে না।

রাজাকারদের দস্যুপনা, বর্বরতা সম্পর্কে অনল অবগত। নিচের দিকে তাকিয়ে থাকাই উত্তম। তবুও দুর্যোগ কাটে না। সন্দেহজনদের শুধু আইডি কার্ড নয় – দোয়া, কলমা পর্যন্ত বলতে হয়।

অনলকে জিজ্ঞাসা করলে স্নায়ুর চাপে মৃত্যু সংবাদে সংবাদপত্রে সদ্য পঠিত *ইন্নালিল্লাহে ... রাজেউন* দোয়াটি বলে দেয়। রাজাকারের দল ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যাত্রীদের সামনে উলঙ্গ করে মুসলমান, না হিন্দু এ পরিচয় জেনে ক্ষান্ত হয়। এতো বড় অপমানের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় ছিল না অনলের। রাগে দুঃখে চোখের পানি গড়িয়ে পড়ে। ভদ্রমহিলাসহ অন্য যাত্রীরা ভিন্ন দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

শুধু অস্ত্রের জোরে ভিন্ন দেশিরা অপমান করে যায়, অনলরা নিজ দেশে আজ পরবাসী।

এ যন্ত্রণা শুধু ভুক্তোভোগিরাই অনুধাবন করতে পারে। বর্তমানে পারছে ইরাকি জনগণ। আমেরিকান পশুরা গণতন্ত্রের নামে, মানবতার পোশাকে অনুরূপ খেলা খেলছে ইরাকিদের সঙ্গে যা ১৯৭১ সালে পাকহানাদাররা করেছে বাংলাবাসীদের সঙ্গে।

অনলদের কারো কাছে কিছু পায়নি। রাজাকার দুই একজন নেমেও গেছে। কয়েকটি ভেতরে। তার মধ্যে একটি রাজাকার মহিলার স্বামীকে দেখিয়ে অকথ্য গালি দিয়ে বলে উঠলো, শালা মুক্তি হ্যা। বগির সকলে হতবাক। কারো মুখে টু শব্দটি নেই।

ভদ্রলোকও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হঠাৎ সংবিৎ ফিরে ভদ্রলোক বললেন যে, সে মুক্তিবাহিনী নয়।

অফিসের আইডি কার্ড আবার দেখালো। স্ত্রী ও বাচ্চাকে নিয়ে ঢাকায় ফিরছে, মালিবাগ বাসা। কিন্তু কার কথা কে শোনে। হায়েনার দলের তো মানবিকতা, প্রেম, দয়া, ভালোবাসা, সত্য-মিথ্যা যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা নেই। ভদ্রলোককে নামতেই হবে।

ভদ্রমহিলা হাউমাউ করে কাদছে, বাচ্চাটিও কাদছে, শিশু মন হয়তো আচ করতে পারছে কি সাংঘাতিক বিপদ সম্মুখে। ভদ্রলোকের কোনো কথা, অনুনয়-বিনয়, প্রার্থনা রাজাকারের দল শুনবে না।

যে কয়েকটি রাজাকার বগি ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে নেমেছিল তারা পুনরায় বগিতে ওঠে। ভদ্রলোককে নামাতে টানা হ্যাচড়া করে চলছে। ভদ্রলোক বাচ্চাটিকে বুকে চেপে ধরে বাচ্চার কসম খেয়ে, ধর্মের দোহাই দিয়ে বলছে, সে মুক্তি না, সরকারি কর্মচারী। কান্নায় জড়িত কণ্ঠে সুরা বলে প্রমাণ করতে চাচ্ছে সে মুসলমান।

কিন্তু বাংলায় জন্মে, বাংলার খেয়ে, বাংলার আলো-বাতাসে বড় হয়েও নিমকহারামদের মনে সহানুভূতির জন্ম হয় না। শেষ পর্যন্ত মারধর করে ভদ্রলোককে নামিয়ে রাখলো। অনলরা প্রতিবাদ করবে, বাধা দেবে তো দূরের কথা, ছল ছল করা চোখের পানি ফেলতেও ভয় পাচ্ছে পাছে না তাদেরকেও সন্দেহ করে।

ভদ্রলোককে নামানোর পর ট্রেন ছেড়ে দিল। চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে অনল দেখলো ভদ্রলোককে প্ল্যাটফর্মেই লাথি-গুতা, রাইফেলের বাট দিয়ে আঘাত করে চলছে। ভদ্রমহিলার চিৎকারে কান্নায় আকাশ-বাতাসও স্তব্ধ। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা কারো মুখে নেই। বোবা কান্নায় চোখের জল কেউ বাধা দিয়ে রাখতে পারছে না।

অনলের কিশোর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, আল্লাহ্, ঈশ্বর কি ঘুমিয়ে আছে? না, দেখেও না দেখার ভান করছে? হতে পারে নিরস্ত্র, নিরপরাধীদের কান্নায় খোদার আরশ কাপে না।

অবশেষে ট্রেন কমলাপুর স্টেশন নামলো। জুলুমের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য বগির সকলেই মহিলাকে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে বললো। বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে অনল প্রায় জনমানবহীন কমলাপুর স্টেশন অতিক্রম করে রিকশা নিয়ে ভদ্রমহিলাকে নারিন্দা পর্যন্ত পৌছে দিল। আশ্চর্যের বিষয়, সারাটি রাস্তায় দীর্ঘ সময় কোনো কথা বা সান্ত্বনা জাতীয় শব্দ অনল খুজে পেল না।

স্বাধীনতার অনেক পর নারিন্দার সেই বাসায় অনল খোজ নিতে গিয়েছিল ভদ্রলোক ফিরে এসেছিল কি না জানার জন্য। বাসায় নতুন আগতরা কেউ ঘটনার কোনো হদিস দিতে পারেনি।

আজো ট্রেন দেখলে, জাতীয় পতাকা দেখলে, জাতীয় সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান শুনলে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ পাঠ শুনে চৌত্রিশ বছর আগে ঘটে যাওয়া সেই স্মৃতি চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে।

অনলের আজো খুব জানতে ইচ্ছে করে ভদ্রলোকটি কি তার স্ত্রী, সন্তানের কাছে ফিরে আসতে পেরেছিলেন?

মেয়েটি এখন কতো বড় হয়েছে?

নির্বাক প্রতিবাদ, প্রতিরোধহীন অক্ষম অনলদেরকে কি সে ক্ষমা করতে পেরেছে?

জার্মানি থেকে

অপারেশনের মুখে

- ফাহিমা

বিসিএস পরীক্ষা দিতে ঢাকায় গিয়েছিলাম। সেটা সম্ভবত ১৯৯৮ সাল নাগাদ। ঘটনাটি ঘটে ফেরার পথে। *জয়ন্তিকা* ট্রেনে আসছিলাম। জয়ন্তিকার সিলেট আসতে রাত হয়ে যায়। ঢাকা থেকে রওনা হয়েছি। গন্তব্য মাইজগাও স্টেশনে। আমি এবং আমার দুই ভাই ছিল সঙ্গে। আমার বড় ভাই আসার পথে আখাউড়া স্টেশনে নেমে যায় ওর ব্যবসায়িক প্রয়োজনে।

শায়েস্তাগঞ্জ ছেড়ে ট্রেন শ্রীমঙ্গল অভিমুখী। দুই স্টেশনের মাঝখানে ট্রেন হঠাৎ থেমে যায়। যাত্রীবেশী ডাকাতরা ট্রেন থামিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে ওই জায়গা থেকে আরো ডাকাত ট্রেনে উঠে পড়ে। ট্রেন থামিয়ে ওরা ওদের অপারেশন শুরু করে। সংখ্যায় ওরা বেশ কয়েকজন। আমাদের কম্পার্টমেন্ট মূলত শায়েস্তাগঞ্জের। বেশির ভাগ যাত্রীই শায়েস্তাগঞ্জে নেমে পড়েছে।

কম্পার্টমেন্ট এমনিতেই ফাকা। যাত্রীরা আমাদের বগির দরজা লাগিয়ে দিল। ফলে ডাকাতরা আমাদের বগির দিকে আসতে পারছে না আর তেমন চেষ্টাও করছে না। কারণ ওদিকের অপারেশন শেষ হলে হয়তো আমাদের দিকে আসতো।

মনে মনে দোয়া–কালাম পড়ছি আর স্বাভাবিকভাবেই গল্পগুজব করছি।

আমার পরিচিত এক ছেলে আমার স্বাভাবিকতা দেখে বললো, সারা ট্রেনের মেয়েরা কেদেকেটে একাকার করে দিচ্ছে আর আপনি দিব্যি গল্প করছেন!

গল্প করলেও মনে মনে কিছুটা ভয় করছিলাম আর বেশি ভয় করছিলাম আমার ভাইয়ের জন্যে। কারণ ডাকাতরা নার্ভাস করার জন্যে বগিতে উঠেই ইয়ং ছেলেদের এটাক করছে। পাশের বগিতে শুনলাম মাইজগাওয়েরই এক ছেলের ত্রিশ হাজার টাকা নিয়ে নিয়েছে। আরো সোনা, টাকা নিচ্ছে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

প্রায় দেড় ঘণ্টা চললো এই অপারেশন। আমাদের একদিকে ডাকাত, অন্যদিকে ফার্স্ট ক্লাস।

ফার্স্ট ক্লাসের এক ভদ্রলোক দুই হাতে দুই পিস্তল উচিয়ে (সম্ভবত লাইসেন্সকৃত) ডাকাত অভিমুখে চললেন। কিন্তু আমাদের বগিতে বাধা পেলেন। কারণ নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না তিনি কোন দলের। তিনি বাধা পেয়ে নিচে গিয়ে চিল্লাচিল্লি করে সম্ভবত অন্য বগির দরজা খোলানোর চেষ্টা করলেন। মনে হয় ডাকাতরা দরজা বন্ধ রেখেছিল। তাই হয়তো তিনি আক্রমণ করতে পারলেন না ওদের।

যাহোক, দেড় ঘণ্টার মাথার ট্রেনের ড্রাইভার কিভাবে যেন ট্রেন ছাড়তে পারলো এবং ডাকাত দল চেষ্টা করলো পালিয়ে যেতে। কিন্তু যাত্রীরা দুই তিনজনকে ধরে রাখলো এবং গণপিটুনি দিল। মারা যায়নি কেউ। জীবন্ত লাশ ফেলা হলো শ্রীমঙ্গলে।

তবে আমাদের ভোগান্তির এখানেই শেষ হলো না। আরো ছিল কপালে। মোগলাবাজারে মালগাড়ি পড়েছে। তাই পাহাড়িকা মাইজগাও আটকেছে এবং জয়ন্তিকা কুলাউড়ায়। তবে ওটাকেও নাকি মাইজগাও পর্যন্ত আনা যেতো। জানি না ওটা দায়িত্বহীনতা, নাকি কোনো সমস্যা ছিল সত্যিই।

রাত বারোটা বেজে গেছে কুলাউড়ায় আসতে। এখন কি করবো? সম্ভবত ট্রেনেই রাত কাটাতে হবে ভাবলাম। সেটা অবশ্য করতে হলো না, ভাগ্য এখানে এসে সুপ্রসন্ন হয়ে গেল একটু। আমাদের পরিচিত ট্রেন সংশ্লিষ্ট এক ছেলে এসে জানালো মাইজগাও অভিমুখে একটা মালগাড়ি আসবে।

আমরা মালগাড়ির একদম পেছনের ফাকা জায়গায় গাদাগাদি করে যে কয়জন পারলাম চললাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার, মোমবাতি একটা জ্বালানো হলো, বাতাসের ঝাপটায় ওটারও আলো নিভু নিভু। শেষ পর্যন্ত রাত দেড়টার দিকে গন্তব্যে এসে পৌছালাম।

ফেঞ্চুগঞ্জ থেকে

এক সুতোয় বাধা

- জালাল উদ্দিন

আমি ঢাকা গেলে যাওয়ার সময় বাসে যাই। কিন্তু আসার সময় ট্রেনে আসি। এটি আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ঢাকা থেকে আসার সময় রাত দশটার ট্রেনে উঠি। আমাকে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে নামতে হয়। সেখান থেকে মৌলভীবাজার আসি বাসে করে। ডাকাতের আংতকে নাইট কোচে আসি না, ট্রেনেই আসি।

২০০২ সালের জুন মাসের প্রথম দিকের ট্রেন ভ্রমণের কথা আমার খুব মনে পড়ে।

সেদিন রাতে ঢাকা থেকে বাড়ি আসার জন্য ট্রেনের টিকেট কেটেছিলাম। রাত দশটার আগেই ট্রেনে উঠলাম। *শোভন*–এর সিট। জানালার পাশে সিট। আমার পাশে একজন তরুণ। আমাদের সামনের সিটে (মুখোমুখি) একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ও তার পাশে একজন তরুণী বসে রয়েছে।

ঢাকা থেকে ট্রেনে এলে রাতে আমার জন্য একটু সমস্যা হয়ে যায়। তা হলো আখাউড়া পার হওয়ার পর উৎকণ্ঠায় থাকি কখন ট্রেন শ্রীমঙ্গল স্টেশনে আসবে। কারণ শ্রীমঙ্গল স্টেশনে আমাকে নেমে যেতে হয়।

ঘুমের ঘোরে যদি না নামি তাহলে কুলাউড়া স্টেশনে চলে যাবো। সেখান থেকে বাড়ি ফিরতে বেশ ঝামেলা হয়ে যায়। কারণ সকাল সাতটার আগে বাস পাওয়া যায় না। তাই ট্রেনে উঠে আমার পাশে যে বসে তাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কতোদূর পর্যন্ত যাবেন। তিনি যদি বলেন, শ্রীমঙ্গল তাহলে ওনাকে বলি, শ্রীমঙ্গল স্টেশনে আসার আগে যেন আমাকে দয়া করে বলেন। তাহলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

দেখেছি ট্রেনে পাশের সিটের ভদ্রলোক সত্যিকার অর্থে ভদ্রলোক হন। অন্তত আমার বেলায়। কারণ কাউকে না কাউকে পেয়ে যাই যিনি শ্রীমঙ্গল স্টেশনে ট্রেন আসার তিন চার মিনিট আগে আমাকে বলেন, ভাই, শ্রীমঙ্গল তো এসে গেছেন।

ট্রেনে চড়লে সময় কাটানোর জন্য ফান ম্যাগাজিনের শরণাপন্ন হই। তাতে সময় বেশ ভালোই কেটে যায়। ম্যাগাজিন পড়ছিলাম। এবং মাঝে মধ্যে চোখ তুলে সামনের সিটে বসা মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছি। সুন্দরী মেয়ে। গোলাপি জামা পরনে তাই ওকে আরো বেশি সুন্দর লাগছে। সে একমনে *সেবা প্রকাশনী*–র একটি বই পড়ছে। মেয়েটির যে ব্যাপারটি দেখে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে তা হলো, মেয়েটি যখন ওর পাশের ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথা বলছে তখন মেয়েটির গালে টোল পড়ছে। এই ছোট্ট টোলটি মেয়েটির সৌন্দর্য যে কতোগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে তা সম্ভবত এই মেয়েটি জানে না। জানলে মেয়েটি কারণে–অকারণে কথা বলতো এবং সেজন্য ওর গালে টোল পড়তো, আরো সুন্দর লাগতো।

আমাদের বামপাশে একজন ভদ্রমহিলা ও একটি তরুণী (সে টপস পরেছে, সঙ্গে জিন্স)। ওদের সামনে একজন ভদ্রলোক ও একটি বাচ্চা ছেলে বসে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা একই পরিবারের সদস্য। মা–মেয়ে (সম্ভবত) হেসে হেসে গল্প করছে।

আমার পাশের সিটের তরুণটির সঙ্গে আলাপ হলো। ওর নাম নবীন। ও ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ওর মূল বাড়ি রায়শ্রীতে। এখন বাড়ি যাচ্ছে।

চাওয়ালা এলো। চা খাওয়ার জন্য নবীনকে প্রস্তাব দিলাম।

ও রাজি হলো। নবীন আমাকে নিচু কণ্ঠে বললো, সামনের সিটের ভদ্রলোককে চা খাওয়ার প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে। তারপর নবীন স্মার্ট ভঙ্গিতে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে বললো, হ্যালো, আপনাকে একটু ডিস্টার্ব করছি। কিছু মনে করবেন না। আমরা চা খাচ্ছি। আমরা যদি ভদ্রতাবশত আপনাকে চা খাওয়ার প্রস্তাব দিই তাহলে আপনি কি প্রস্তাবটা গ্রহণ করবেন?

নবীনের সহজ ভঙ্গিতে প্রস্তাব দেয়াটা আমার ভালো লাগলো।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক হাসলেন। নবীনের বাড়ি কোথায় তা জিজ্ঞাসা করলেন।

নবীন বললো। এবং ভদ্রতার সঙ্গে নবীনও ভদ্রলোকের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলো।

ভদ্রলোক যে জায়গায় ওনার বাড়ির কথা বললেন, দেখা গেল সে উত্তর মুলাইম–এ নবীনের নানা বাড়ি।

চা এলো। ভদ্রলোকসহ মেয়েটি চা খেলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে নবী গল্প করতে লাগলো। সঙ্গে আমিও।

জানতে পারলাম, ভদ্রলোকের নাম খালেক। ওনার বড় মেয়ে ইরা – ঢাকায় বিয়ে দিয়েছেন। সেখানে ছোট মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। কয়েকদিন থেকে এবার বাড়ি যাচ্ছেন। জানতে পারলাম খালেক সাহেবের ছোট মেয়ের নাম নীরা।

দেখছি নীরা মাঝে মধ্যে বই থেকে মুখ তুলে ওর বাবার দিকে তাকাচ্ছে। সম্ভবত ওর গল্পের মানুষটিকে আমরা কব্জা করে ফেলায় ও টুকটাক গল্প করার লোক পাচ্ছে না।

মি. খালেক বেশ মজার মানুষ তা বুঝতে পারলাম। তিনি নবীনকে বললেন, তুমি যে আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য ঘড়িতে সময় কতো তা জিজ্ঞাসা করোনি সে জন্য ভালো লাগছে। আলাপ করার জন্য আবহাওয়ার অবস্থা আর সময় জিজ্ঞাসা করাটা একটা সহজ ব্যাপার হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, ঘড়িতে সময় কতো জিজ্ঞাসা করলে কোনো সমস্যা ছিল?

খালেক বললেন, সমস্যা ছিল না। কিন্তু ব্যাপারটা কি ওই গল্পের মতো হয়ে যেতো না!

জিজ্ঞাসা করলাম, কোন গল্পের মতো?

তিনি বলতে লাগলেন, এ রকম ট্রেনে করে যচ্ছিলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটি তরুণ। সিটটা পাশাপাশি ছিল। তাদের আশপাশে আরো অনেক যাত্রী ছিলেন। কিছু সময় পর তরুণটি প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সময় কতো তা জিজ্ঞাসা করলো।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।

তরুণটি আবার সময় কতো জিজ্ঞাসা করলো।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।

কিছুক্ষণ পর তরুণটি উঠে ট্রেনের টয়লেটে গেল।

তখন প্রৌঢ়ের সামনের সিটের একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বললেন, আপনার কাছে তো ঘড়ি আছে। আপনি তো ওকে সময়টা বলতে পারতেন।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, আমার আর খেয়ে-দেয়ে কোনো কাজ নেই নাকি! আমি ওকে সময় বলি, তারপর ও আমাকে ধন্যবাদ দেবে। এবং সামনের স্টেশনে গিয়ে ও আমাকে কোল্ড ড্রিংকস খাওয়াবে। ওর ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে ভদ্রতাবশত ওকে আমার বাসার ঠিকানা দেবো। একদিন বিকেলে দেখবো ছেলেটি আমাদের বাসায় চলে এসেছে। তারপর আমার মেয়েগুলোকে দেখবে। একটি মেয়েকে ও পছন্দ করবে। এবং আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ও আমতা আমতা করে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। কিন্তু আমি এমন ছেলের কাছে মেয়ে বিয়ে দেবো না যার হাতে সময় দেখার জন্য ঘড়ি থাকে না।

খালেক সাহেব বেশ মজা করে গল্প করছেন। আমাদের সঙ্গে নীরাও হাসছে।

বুঝতে পেরেছি বইয়ে চোখ থাকলেও মন ছিল ওর বাবার বলা কথার দিকে। হাসলে যে নীরার টোল পড়া অবস্থায় নীরাকে কতো সুন্দর লাগে তা কি নীরা জানে? সুযোগ পেলে নীরার টোলের কথা নীরাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।

নবীন আর খালেক গল্প করছেন। আমি নীরার দিকে তাকালাম। তারপর ওপাশে টপস পরা মেয়েটির দিকে তাকালাম। মেয়েটির হাত থেকে কিছু সম্ভবত সিটের নিচে পড়ে গিয়েছিল। তাই মেয়েটি নিচু হয়ে সে জিনিসটা তুলছে। এবং নিচু হওয়ার জন্য ওর বুকের প্রায় সবটুকু (টপসের গলা বড় থাকায়) দেখা যাচ্ছে। টপসের সঙ্গে ওড়না পরা হয় না। আমি ওদিক থেকে চোখ সরাতে চেয়েও সরাতে পারলাম না। এবং সম্ভবত তৃতীয় নয়নের জোরে মেয়েটি আমার দৃষ্টি অনুভব করতে পারলো। আমার দিকে তাকালো।

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। দৃষ্টি দিয়ে বোঝাতে চাইলাম, ভয় নেই, যা দেখেছি তা কাউকে বলবো না।

মেয়েটি সোজা হয়ে সিটে বসলো। এবং আড়চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগলো।

ও আমার দিকে তাকালেই আমি ওর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসার চেষ্টা করি।

এদিকে নবীন ও খালেকের গল্প জমে উঠেছে।

খালেক এবার হজের একটি ঘটনা বললেন। তিনি বললেন, তিনি হজ করতে গিয়েছিলেন। মিনা থেকে আসার সময় বাসে উঠেছিলেন। ওনার পাশের সিটে একজন পাকিস্তানি বসেছিল। ওনারা যার যার হাতব্যাগ বাসে উপরের তাকে রেখেছিলেন। এক সময় বাস থামার পর পাকিস্তানিটি হাতব্যাগ নিয়ে নেমে গিয়েছিল। খালেকও তার ব্যাগ নিলেন। কিন্তু রুমে এসে দেখলেন হাতব্যাগ বদল হয়ে গিয়েছে। ওনার হাতব্যাগে ছিল তিনটি শাদা কাপড় ও একজোড়া তসবিহ। অথচ এ ব্যাগে দামি কাপড় ছাড়া দামি অনেক আতর ও অন্যান্য কিছু দামি জিনিসপত্র ছিল।

তিনি খোজখবর নিয়ে সরকারি ভবনে ব্যাগটি ফেরত দিতে গেলেন।

অফিসার ভদ্রলোক খালেককে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কোন দেশের নাগরিক?

খালেক বললেন, বাংলাদেশের।

এটি জানার পর অফিসার অবাক হয়ে বলেছিলেন, বাঙালিরা কোনো কিছু খুজে পেলে ফেরত দেয় এমন কথা তিনি শোনেননি।

খালেক ওনার কথা শেষ করলেন।

নবীন বললো, আসলে বাঙালিকে নিয়ে অন্যদের ধারণা যে খারাপ সেটার পরিবর্তন বাঙালিদেরকেই করতে হবে।

ট্রেন ভৈরব বৃজ পার হচ্ছে।

আমি নীরার দিকে তাকালাম।

ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। তাই বই কোলের ওপর রেখে নবী ও তার বাবার গল্প শুনছে।

আমি নীরার দিকে তাকাচ্ছি।

নীরা ভুল করেও আমার দিকে তাকাচ্ছে না।

টপস পরা মেয়েটির দিকে তাকালাম।

মেয়েটি এখন আর আড়চাখে তাকাচ্ছে না। সরাসরি আমার দিকে তাকাচ্ছে।

নবীন খালেককে বললো, কিছুদিন আগে নাকি এক বাঙালি ভদ্রলোক মিডল ইস্টের এক দেশে তেলাপিয়া মাছ রফতানি করার কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলেন। বাঙালিরা অতি কম সময়ে বেশি লাভ করতে চায়। ধৈর্য কম। সে হিসাবে এই বাঙালিও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তিনি তেলাপিয়া মাছের ভেতর ছোট ছোট পাথর ভরে দিতেন যাতে ওজনে বেশি হয়। কিন্তু তিনি ধরা খেয়ে গেলেন এবং কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এখন মিডল ইস্টের এই দেশ ইনডিয়া থেকে তেলাপিয়া মাছ আমদানি করে।

নবীনের বলা গল্প নীরা পুরোপুরি মুগ্ধ হয়ে শুনছে।

নীরার সঙ্গে আমার আর কোনোদিনও দেখা হবে না এটা জানি। তাই আমার খুব ইচ্ছা করছিল গালে টোল ফেলে হাসলে বা কথা বললে নীরাকে যে খুব সুন্দর লাগে তা জানানো।

সুযোগ খুজছিলাম। কিন্তু এ ট্রেন ভ্রমণে সে সুযোগটি পাইনি।

মৌলভীবাজার থেকে

ja_ja_jalal_uddin@yahoo.com

অপ্রীতিকর

- সায়ফুল ইসলাম

দেশ স্বাধীনের পরের কথা বলছি। ঢাকা–চট্টগ্রাম বাস সার্ভিস তখন এতোটা উন্নত হয়নি। আর নাইট কোচ সার্ভিসও চালু হয়নি তখন। ফলে যোগাযোগ ছিল মূলত ট্রেন নির্ভর। ট্রেন থাকতো বরাবরই যাত্রীতে ঠাসা। অসংখ্যবার দীর্ঘপথ ঠায় দাড়িয়ে ট্রেন জার্নি করেছি।

একবার সারা রাত ট্রেনে দীর্ঘ সাত ঘণ্টা একই স্থানে স্থির দাড়িয়ে থেকে সকালে যখন ঢাকা পৌছাই পা দুটো তখন ফুলে কলাগাছ। এই দীর্ঘ দিন পরেও সেসব কষ্টের ভ্রমণের কথা আজো ভুলতে পারিনি। এখন দূরপাল্লার ট্রেনগুলোতে নির্দিষ্ট আসন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় এসব দুরবস্থার অনেকটা অবসান হয়েছে।

ফেনী–বিলোনিয়া সাব রেললাইনের আউটার সিগনালের কাছেই বড় ভাইয়ের বাসা। একটি কয়লার ইঞ্জিন হুস হুস করে আজন্ম এই রুটের রেলগাড়িটিকে টানা হ্যাচড়া করে আনা–নেয়া করেছে। কয়েক বছর আগে এই ট্রেনটির অপমৃত্যু ঘটেছে।

ভাইয়ের বাসার সামনে আউটার সিগনালের গোড়ায় নিত্যদিন রুটিন মাফিক ট্রেনটি থেমে যেতো। এখানে এসে কানফাটা বেশ কয়টি হুইসল মারাও ছিল ট্রেনটির রুটিন ওয়ার্ক। প্রায় সব বিনা টিকেটি যাত্রীরা এখানেই কেটে পড়তো। স্টেশন সংলগ্ন ফেনী কলেজের গুটিকয়েক ছাত্রকে নিয়ে শূন্য ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে পা রাখতো।

ছাত্রদের দেখলে টিকেট কালেকটররা গেট ছেড়ে সরে যেতেন। তাদের কাছে টিকেট চাইবে কার বাপের সাধ্যি। লোকাল সব স্টেশনগুলোতে ইন করার বেশ আগ থেকেই ধীর গতিতে হুইসল দিতে দিতে ট্রেনটি এগিয়ে আসতো। ট্রেনের আগমন বার্তা পেয়েই স্টেশন অদূরবর্তী বাড়িঘর থেকে যাত্রীরা স্টেশন অভিমুখে ভো দৌড় দিতো।

ট্রেনটি সাধারণত কাউকেই রেখে যেতো না। ট্রেনের সম্মুখ অভিমুখী যাত্রীরা স্টেশনে পৌছাতে সক্ষম না হলেও রেললাইনে দাড়িয়ে দশ টাকার নোট উচিয়ে হাত নাড়লে ট্রেনটির গতি মন্থর হয়ে যেতো বলে যাত্রীদের কাছে শোনা যেতো।

ওই ট্রেন থেকে কখনো দুই পয়সা আয় হয়েছে বলে সরকারি কোনো নথিপত্রে প্রমাণ মিলবে এমনটি মনে হয় না। লোকসানি ট্রেনটির অপমৃত্যুতে হুইসলের বিকট শব্দ আর কোলাহলমুক্ত হয়ে ভাইয়েরাও বেশ খুশি।

এই মৃত ট্রেনটি এখন একটি স্থায়ী রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে কাজ করছে। নেতারা নির্বাচনে জিতলে ট্রেনটিকে পুনর্জীবন দানের প্রতিশ্রুতি দেন। জেতার পরে চুপ মেরে যান।

ইওরোপে ট্রেন জার্নি নির্ভরযোগ্য, আরামদায়ক ও রোমাঞ্চকর। এখানকার দ্রুতগামী ট্রেনগুলো ঘড়ির কাটায় কাটায় চলে। তাই এখানে হাজারো অফিসযাত্রী আর ছাত্রছাত্রী ট্রেন নির্ভর। দূরপাল্লার ট্রেনে চেপে সামনের টেবিলটি পেতে ছাত্রছাত্রীরা নীরবে, নির্বিবাদে তাদের অসমাপ্ত পড়াশোনা ও হোমওয়ার্ক সেরে নেয়। কেউ বা মুখ গুজে থাকে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা নাটক–নভেলে। পাশের যাত্রীর দিকে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত কই তাদের!

আমাদের দেশের ট্রেন ও স্টেশনগুলো কাচাবাজারের মতোই সর্বদা সরগরম থাকে। বইপত্রে মনোনিবেশের অবকাশ কই! বিদেশে যাত্রীরা নীরব দৃষ্টিতে তাদের অতীত যৌবনের স্মৃতি রোমন্থনে মগ্ন থাকেন। ইওরোপের ট্রেনে মাঝে মধ্যে তরুণ–তরুণীদের প্রেমাবদ্ধ দেখা যায়।

ট্রেনে এই ঢলাঢলির পরিবেশে ইওরোপে নবাগত আমরা শরমে মরে যেতে থাকি। আমাদের দেশে এমন দেখলে সাধারণ যাত্রীরা এদের পাজা কোলে করে তুলে জানালা দিয়ে নির্ঘাত বাইরে ছুড়ে ফেলতো।

ইওরোপ মহাদেশ জুড়ে ট্রেন নেটওয়ার্কের আওতায়। স্বল্প খরচ আর নির্বিবাদে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়ানো সম্ভব। নির্ঝঞ্ঝাটে ট্রাভেল এজেন্সি থেকেও টিকেট সংগ্রহ করা যায়।

ছাত্র জীবনের কথা বলছি। রোম থেকে ফ্লোরেন্স, মিলান, ভেনিস ও সীমান্ত শহর ট্রিয়েস্ট হয়ে বেলগ্রেড পর্যন্ত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিন বন্ধু মহানন্দে ট্রেনে চেপে বসি। ট্রাভেল এজেন্ট এক তন্বী তরুণীর মোহময় হাসিতে বিগলিত হয়ে ট্রাভেল ও ভিসা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন জেনে নেয়ার যে সব উপদেশ সে দিয়েছিল তা বেমালুম ভুলে যাই। টিকেট কেটেই খালাস। আবার রোম-এ ফিরবো বলে অপ্রয়োজনীয় লাগেজপত্র সেখানেই ছেড়ে যাই।

বেলগ্রেড সফর শেষে পুনরায় রোম-এর টিকেট কাটতে আরেক মোহনীয় তন্বীর দ্বারস্থ হলেই ভিসার রুলস জেনে আমাদের মোহভঙ্গ হয়। জানতে পারি ইটালির ভিসাটি মাল্টিপল নয় বিধায় আমাদের আবার রোম-এ প্রবেশ সম্ভব নয়।

রীতিমতো কান্না পেল। সিঙ্গল আর মাল্টিপল ভিসার ব্যাপার-স্যাপার সেই প্রথম জানতে পারলাম। শেষে বাংলাদেশ দূতাবাসের সহায়তায় পুনরায় ইটালির ভিসা পেতে সক্ষম হই।

স্বর্ণকেশী এবার হাসি মুখে টিকেট হাতে তুলে দিল। বেলগ্রেড থেকে রোমের উদ্দেশ্যে আবার মহানন্দে ট্রেন যাত্রা। সীমান্ত শহর ট্রিয়েস্ট-এ পৌছালে ট্রেনটি প্রায় যাত্রীশূন্য হয়ে পড়ে।

এখানে একজন দশাসই গোছের চেকার ওঠে। আমাদের টিকেট ও পাসপোর্ট সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলো। এরপর লাগেজের ভেতরের প্রতিটি আইটেম তন্ন তন্ন করে চেক করলো। ব্যবহার্য টয়লেট সোপটিতে চাকু ঢুকিয়ে, এমনকি দুধ, চিনির ডিব্বাও ওলটপালট করে দেখলো সে। খালি ব্যাগের তলদেশও দেখলো খুটিয়ে। এরপর সিট ছেড়ে প্যাসেজে দাড়াতে বলে আমাদের সিটের নিচেও উল্টেপাল্টে দেখলো।

বুঝতে বাকি রইলো না যে, কোনো গোপন রিপোর্টের ভিত্তিতে তারা আমাদের স্মাগলার বা অবৈধ কোনো কারবারী সন্দেহে এই কড়া তল্লাশি চালালো। পরিশেষে আমাদেরকে সিটে ফিরে যেতে বলে হতাশ মনে চেকারটি নেমে গেল।

ট্রেন ভ্রমণের সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিটির কথা মনে হলে আজো খারাপ লাগে।

জেদ্দা থেকে

ব্যাংগালোর সিটি টু হাওড়া

- রবি

লং ডিসটান্স জার্নি করার ক্ষেত্রে আমি বরাবরই ট্রেনের পক্ষে। পড়াশোনার কারণে থাকি ঢাকায়। বাবা-মা থাকেন চট্টগ্রামে। তাই প্রায়ই ঢাকা-চট্টগ্রাম জার্নি করা হয়।

গত পাচ বছরে একবার কেবল মামার সঙ্গে প্রাইভেট কারে চট্টগ্রাম গিয়েছিলাম। অন্য সব বার ট্রেনে।

আমাদের পরিবারের ট্রাডিশনটা হলো যখন দূরে কোথাও যাওয়ার দরকার পড়ে, প্রথমে দেখা হবে ট্রেন আছে কি না, না থাকলে অন্য কিছুর কথা ভাবা হবে।

ইনডিয়ার ব্যাংগালোর থেকে কলকাতা। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা এটি। বাবার বাইপাস সার্জারি করার জন্য আমি, মা, বাবা এবং আমার এক কাজিনসহ আগস্ট মাসের ১২ তারিখে ব্যাংগালোর গিয়েছিলাম। বাবার শরীর খারাপ থাকার কারণে যাওয়ার সময় কলকাতা থেকে সাহারা এয়ারে ব্যাংগালোর যাওয়া হয়। যাওয়ার সময় আমরা ভেবেছিলাম পনেরো দিনের মধ্যে অপারেশনে শেষে আমরা দেশে ফিরতে পারবো। কিন্তু এনজিওগ্রাম নতুন করে করানো এবং অপারেশনের পর আইটিইউ-তে বাবার শরীর খারাপ করায় আমাদের সময় কিছুটা বেশি লেগে যায়।

যাই হোক। বাবা সুস্থ হওয়ার পর ৯ তারিখে মাসহ বিমানে কলকাতা এসে পড়েন এবং আমাদের ছিল ১০ তারিখ রাতের হাওড়া স্পেশাল ট্রেনের এসি থ্রি টিয়ার স্লিপারের টিকেট।

১০ তারিখ সকালবেলা আমি আর কাজিন মিলে ব্যাংগালোর শহরে ঘুরতে বের হই। তবে কিছুক্ষণ পর পরই কল্পনা করছিলাম রাতের ট্রেন জার্নির কথা। যেহেতু এসি কম্পার্টমেন্ট, নিশ্চয়ই অনেক সুন্দর মেয়ে উঠবে যারা পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার থেকে ব্যাংগালোর পড়তে আসে। ব্যাংগালোর শহরে ঘুরতে বের হলেই বিভিন্ন কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়া অসংখ্য ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের আউটলুক খুবই স্মার্ট। বেশির ভাগ মেয়েই জিন্স, গ্যাবার্ডিন-এর প্যান্টের সঙ্গে টি শার্ট অথবা ওড়না ছাড়া শর্ট কামিজ পরে। ওড়না পরতে সেখানে খুব একটা দেখা যায় না। এ রকম দুই একজন তরুণীকে আমার পাশের সিটে কল্পনা করে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম।

বিভিন্ন ললনার সান্নিধ্যের কথা কল্পনা করতে করতে বৃষ্টির মধ্যে রাত নয়টায় আমরা ব্যাংগালোর সিটি স্টেশনে পৌছি। সেখানে তখন এক ছোটখাটো জনসমুদ্র। বিভিন্ন প্রদেশের হাজার হাজার যাত্রী। অনুসন্ধান রুমে গিয়ে জানতে পারি আমাদের আট হাজার চার নাম্বার ট্রেন সাতাশ নাম্বার প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে আছে। আমাদের সঙ্গে খুলনার এক রোগী ছিল। তাদের আসন ছিল অন্য কম্পার্টমেন্টে।

প্রথমেই ট্রেন দেখে কিছুটা হতাশ হই। কারণ আমাদের *সুবর্ণ এক্সপ্রেস* দেখতে এর চেয়ে অনেক সুন্দর। বাইরে দেখে মন খারাপ হলেও ট্রেনে উঠে মন ভালো হয়ে যায়। চারপাশের সব কিছুই খুব পরিষ্কার। ওপরে টিউব জ্বলছে। টয়লেটের স্পেসটা অনেক বড়। এছাড়া বগির দুই মাথায় ঝকঝকে পরিষ্কার আয়নাসহ দুটো বেসিন। লাল ইউনিফর্ম পরিহিত স্টুয়ার্ডরা এসে ব্রেকফাস্টের মেনু নিয়ে গেল। প্রতিটি আসনে ধব ধবে শাদা কভারের বালিশ, বিছানার চাদর এবং গায়ে দেয়ার জন্য কম্বল দেয়া হলো।

এবার যাত্রীদের কথা বলা যাক। যেহেতু কলকাতাগামী ট্রেন, তাই বেশির ভাগই বাঙালি, এছাড়া হিন্দি ভাষাভাষী যাত্রীও ছিলেন অনেক। আমার সিট ছিল মিডলে। ট্রেনে থৃ টিয়ার বগিতে প্রতিটি ব্লকে আপার, মিডল, বটম মিলে দুপাশে ছয়টি সিট থাকে। আমার বিপরীত পাশে ছিলেন বয়স্ক এক দম্পতি। তবে পুরো ট্রেন জুড়ে ছিল অসংখ্য তরুণ-তরুণী।

পাশের ব্লকে দেখলাম খুব স্মার্ট এক মেয়ে ট্রেনে উঠে ব্যাগ গুছিয়ে উপরের সিটে শুয়ে পড়েছে। এই মেয়ে একা যাচ্ছে। ট্রেনে সে দুই রাত একা থাকবে। কোনো ভয় বা সংকোচ নেই। ট্রেনে কম হলেও এ রকম শ চারেক ছেলেমেয়ে ছিল। কি উচ্ছল, স্বাভাবিক তাদের মেয়েরা।

আমি আর আমার কাজিন অবাক হয়ে তাদের দেখছিলাম। ইনডিয়া আমাদের পাশের দেশ, তৃতীয় বিশ্বের দেশ। যেখানে আমাদের মেয়েরা ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের ছয় সাত ঘণ্টার জার্নি করতে আলাদা সিট খোজে। সেখানে তাদের মেয়েরা কি অবলীলাক্রমে ছয় হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিচ্ছে। মেয়েরা ট্রেনে ওঠার পর টয়লেটে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে আসছে। মহিলারা শাড়ি, কামিজ, সেলোয়ার পাল্টে ম্যাক্সি পরে ইজি হচ্ছেন। ছেলেরা পরছে টি শার্ট আর ট্রাউজার।

রাত সাড়ে দশটায় ট্রেন ছাড়লো। যাত্রীরা সব শোয়ার প্রস্তুতি নিল। ট্রেনের সবগুলো কোচ স্লিপার বলে এখানে শোয়ার কোনো সমস্যা হয় না।

জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখতে চেষ্টা করলাম। এসি কম্পার্টমেন্টের মোটা গ্লাস দিয়ে রাতের অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখা যাচ্ছিল না। এক সময় শুয়ে ট্রেনের ঝাকুনিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা স্টুয়ার্ডদের চা, কফির শব্দে ঘুম ভাঙলো। ট্রেন তখন চেন্নাই-এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। এখানে পাশাপাশি চারটি লাইন। দুটি দূরপাল্লার ট্রেনের জন্য, দুটি লোকাল ট্রেনের জন্য।

এক সময় দেখি আমাদের পাশে অন্য আরেকটি ট্রেনও সমান তালে যাচ্ছে। যেন এক প্রতিযোগিতা কে আগে যেতে পারে।

ভোরের আলোয় কফি খেতে খেতে বাইরেটা দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পর আমার কাজিন উঠলো।

দুজন ফ্রেশ হয়ে সহযাত্রীদের গল্প শোনাতে লাগলাম।

ট্রেন দুই আড়াই ঘণ্টা পর পর বড় বড় স্টেশনগুলোতে থামছিল। প্রতিটি স্টেশনের দুটি ব্যাপার উল্লেখ করার মতো। পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা এবং সিগারেট না বিক্রি হওয়া। আমরা মিনারাল ওয়াটার কিনে খাচ্ছিলাম। কিন্তু অনেক যাত্রীকে দেখলাম ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে বোতলে পানি ভর্তি করে নিচ্ছে।

দুই একটা বাদে অন্য সব স্টেশনে আমরা নেমেছি। সবচেয়ে ভালো লেগেছে বিশাখাপট্টম। বড় জাংশন স্টেশন। দ্বিতীয় রাত সাড়ে বারোটায় ট্রেন এখানে পৌছায়। আধাঘণ্টা থেমে ছিল ট্রেন। প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে একটু পর পর ছিল ডিজিটাল ওয়াচ যাতে প্ল্যাটফর্মে দাড়ানো ট্রেনের নাম্বার, কখন ট্রেন ছাড়বে সেটা দেখানো হচ্ছিল। এই গভীর রাতেও স্টেশনের কফি শপ এবং আইসক্রিম পার্লারগুলো নানান বয়সের যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ঝকঝকে পরিষ্কার স্টেশন।

ইনডিয়াতে লং ডিসন্টাসে ট্রেন ভ্রমণের সুবিধা হচ্ছে, এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রদেশ, তার মানুষ, তাদের আলাদা চলার ধরন, পোশাক–পরিচ্ছেদ, দেখা যায়। ব্যাংগালোর থেকে ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ আসতে কর্নাটক, চেন্নাই, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ এসব প্রদেশ দেখা হয়ে যায়। কাজেই দেখা যায় কিছুক্ষণ আগে স্টেশনগুলোতে যে অক্ষর ব্যবহার করে লেখা হয়েছে, এখন আর সেটি নেই। স্থানীয় মানুষের পোশাক পড়ার ধরনও পাল্টে যায়।

ট্রেনে সবচেয়ে বেশি সময় লাগে অন্ধ্রপ্রদেশ পার হতে। কারণ ট্রেন লম্বালম্বিভাবে অন্ধ্রপ্রদেশ ক্রস করে। এখানে দুপাশে কেবল পাহাড়।

ট্রেনে উঠে বসে থাকার চেয়ে কিছুক্ষণ পর পর হাটতে পছন্দ করি। কয়েক ঘণ্টা পর পর ট্রেনের এ মাথা থেকে ও মাথা হাটছিলাম। আমাদের বগিতে আমার একটু দূরের ব্লকে দুটো ছেলেমেয়ের আসন ছিল। চেহারা এবং পোশাক দেখে বোঝা যায় উচ্চবিত্ত ফ্যামিলির ছেলেমেয়ে। যখনই তাদের সামনে দিয়ে যাই, দেখি ছেলেটা আসন করে বসা আর মেয়েটা তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। ছোলেটা দুই হাতে তার গালে আদর করছে অথবা চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে।

ননএসি বগিতে গিয়ে কয়েকজন লিঙ্গ প্রতিবন্ধী (হিজড়া) দেখতে পাই। শুনেছি ট্রেনে নাকি প্রায়ই এরা ওঠে। আমাদের কম্পার্টমেন্টে এক ভদ্রমহিলা (দেখে মনে হয় নতুন বিবাহিতা) টয়লেটে গিয়ে হয়তো ভুলে ঠিক মতো দরজার হুক লাগাননি। আমি টয়লেটে যাবার জন্য ধাক্কা দিতে দরজা খুলে যায়। পরে মহিলার সিটের সামনে দিয়ে হাটার সময় লক্ষ্য করি তিনি লজ্জায় মুখ অন্য দিকে সরিয়ে ফেলেছেন।

ভদ্রমহিলার এতোটা লজ্জা না পেলেও চলতো। কারণ তখন ওনার কাপড় সুশৃঙ্খলই ছিল।

দিনের বেলা ট্রেনের ভেতর হাটার সময় দেখলাম, মেয়েরা বিভিন্ন সিটে কি স্বাভাবিকভাবে ঘুমাচ্ছে। গায়ে কাথা টেনে অথবা ওড়না দিয়ে নিজেকে ঢাকার বাড়তি কোনো চেষ্টা নেই। আর ছেলেরাও সেদিকে তাকাচ্ছে না। হয়তো তারা ছোটবেলা থেকে এভাবে দেখে অভ্যস্ত।

ট্রেনে হরেক রকম খাবার খেয়েছিলাম। ওয়ান টাইপ ট্রেতে কাগজে মুড়ে সুন্দর করে খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবারের মেনু কি হবে তা ছয় সাত ঘণ্টা আগে লিখে নিয়ে যায়। সকালে ব্রেকফাস্টে ভেজিটেবল কাটলেট এবং পাউরুটি। দুপুর এবং রাতে ননভেজিটেরিয়ানদের জন্য এগ কারি, চিকেন কারি, ঝাল চিকেন। চিকেন, এগ যেটাই নিন না কেন, সঙ্গে থাকবে একটা ভেজিটেবল কারি, আচার এবং ফিরনি। এছাড়া আমরা কেক, বিস্কিট, কফি, দই, টমাটোর সুপ কোক খেয়েছিলাম। ট্রেনের খাওয়াগুলো ছিল টেস্টি।

পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর সহযাত্রী বললো, ট্রেন এখনো উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে।

যতোই বাংলার কাছাকাছি আসছিলাম ততোই ঘন বসতিপূর্ণ লোকালয়, পুরনো ধাচের বাড়ি, চারপাশে জলাভূমি দেখতে পেলাম।

ইতিমধ্যে কলকাতার এক ভদ্রলোক (বয়স ত্রিশের কাছাকাছি হবে) এবং বিহারের এক আইটি ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটি বোম্বে থেকে আইটি পাস করেছেন, এখন ব্যাংগালোরে জব করছেন।

গল্প করতে করতে সময় চলে যাচ্ছিল। এক সময় দেখি স্টেশনগুলোতে বাংলা লেখা এবং এখানে বাংলা পত্রিকা বিক্রি হচ্ছে। ১২ তারিখ বিকাল পাচটায় বেয়াল্লিশ ঘণ্টায় দুই হাজার একশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌছে।

পূর্ণ ঠিকানা বিহীন
ঢাকা থেকে

এজতেমায়

- ইহতিশামুল হক

রেজাউল করিম আমার দীর্ঘ দিনের পরিচিত। এক রকম বন্ধুই বলা যায়। তাকে রিজু বলে ডাকি। এতো বড় নামকে এমন শর্টকাটের রূপ অবশ্য আমি দিইনি। খালাম্মা মানে তার মাকে প্রায়ই ওই নামে ডাকতে শুনি। সুতরাং শর্টকাট নামটিই আমার পছন্দ ডাকতে সুবিধা হয় বলে। সেই রিজুদের উত্তরার দোবাদিয়ায় যে বাড়িটি তারা নতুন করলো সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেদিন।

যত্ন–আত্তির পর এক সময় রিজু বললো, শুনলাম, এবারের এজতেমায় নাকি বিনা টিকেটে ট্রেনে করে যাওয়া যায়। জনগণের কল্যাণে সরকার এ সুযোগ করে দিয়েছে। যাবি নাকি?

বললাম, *যদি সত্যিই হয় তাহলে যাবো না কেন? মাগনা পেলে কেউ কিছু ছাড়ে?* সেই ছোটবেলায় একবার মাত্র ট্রেনে উঠেছি কি উঠিনি তাও ভালো করে মনে পড়ছে না। চল চল, এ সুযোগ ছাড়া যাবে না।

যেই ভাবা সেই কাজ। এয়ারপোর্ট রেলস্টেশনে গিয়ে *আন্তঃনগর ট্রেন এক্সপ্রেস*–এ চড়ে বসি। ট্রেন চলতে শুরু করে। আমরা জানালার ফাক গলে প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে থাকি। তখন আমার কি যে আনন্দ লাগছিল। বিনা পয়সায় এমন সুখের ভ্রমণ। অনেকক্ষণ যাওয়ার পর আমাদের চৈতন্য উদয় হলো। আরে, ট্রেন দেখি থামছেই না। ব্যাপার কি! টংগি তো বেশি দূরের পথ নয়। এতো সময় লাগার তো কথা নয়! এজতেমা ছেড়ে যায়নি তো! হাব–ভাবে তো তাই মনে হচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন ট্রেনটির থামার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না তখন সত্যিই ভয় পেতে শুরু করি। হায় আল্লাহ! এ রকম যে হবে তা কে জানতো।

তখন রিজু আমাকে বললো, শোন, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। টিটিদের এড়িয়ে যদি আর কিছুক্ষণ থাকতে পারি তাহলে সামনের স্টেশনেই নেমে যাবো।

তখন শুরু হলো টিটির ভয়। আমরা স্থির থাকতে পারি না। এক বগি থেকে আরেক বগি এভাবে করে সময় পার করতে থাকি। এক সময় দরজার কাছে এসে বাইরের দৃশ্য দেখতে থাকি। ভাবটা এমন যেন অনেকক্ষণ সিটে বসে থেকে আলসেমি ছাড়ানোর জন্য একটু উঠে দাড়ানো আর কি!

হঠাৎ টিটিকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি টয়লেটে ঢুকে পড়ি।

এক সময়ে দরজা খুলে দেখি টিটি এখনো চলে যাননি, উপস্থিত আছেন।

এতোক্ষণের কষ্ট সব বৃথাই গেল।

একনাগাড়ে টিটি আমাদের শাসাতে লাগলেন।

আমার মুখ একেবারে পাংশুবর্ণ। আর বুঝি কোনো উপায় নেই। জেলের ভাত খেতেই হবে। কিন্তু রিজুকে দেখলাম, ও কেমন নির্বিকার। নির্ভীকচিত্তে একের পর এক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি যে কুমিল্লার,

চালাক–চতুর না হলে কি হয়! তাছাড়া ওর বাপও তো পুলিশের দারোগা। তা হলে কি হবে! এখন তো আর কাছে পিঠে কেউ নেই। সুতরাং টিকটিকির কথাই সই।

ওর দারোগা বাপ কিংবা ওর চালাকি কোনোটাই কাজে এলো না। দুজন থেকে মোট আশি টাকা নিয়ে গেল। বলে কি না, ভৈরবের ভাড়া নিলাম চল্লিশ টাকা করে। হাদারাম পেয়েছেন আর কি আমাদের।

নরসিংদী রেল ক্রসিংয়ে এলে ট্রেনটি থেমে যায়। এই ফাকে টিটি দরজা খুলে আমাদের নামিয়ে দেন।

সরল–সহজ গ্রামের লোকেরা কেমন হতবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমাদের দিকে।

রাস্তার মধ্যে এভাবে নেমে যাওয়ায় লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল আমাদের। পায়ে হেটে নরসিংদীর বাস স্টেশনে গিয়ে আবার পচিশ টাকা করে ভাড়া দিয়ে তবেই টংগির ময়দানে পৌছি।

এজতেমায় তো এলামই, সেই ট্রেনে চড়েই এলাম। তবে মাঝখানে বিনা টিকেটে রেলগাড়িতে চড়ে আক্কেল সেলামি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিব্রতকর, লজ্জাজনক ভ্রমণের ঘানিও টানতে হলো।

পল্লবী, ঢাকা থেকে

বাকিটুকু

- মোহাম্মদ মহসিন হিমেল

গার্মেন্টস ব্যবসার কারণে আমাকে খুলনা থেকে সান্তাহার যেতে হয়। কাউন্টারে গিয়ে বললাম, একটি চেয়ার টিকেট দেন।

সে বললো, চেয়ার হবে না।

বললাম, দূরের জার্নি, যদি দয়া করে কিছু টাকা বেশি নিন।

কি যে মুশকিলে ফেললেন, ঠিক আছে, দেন।

মনে মনে বললাম, এখন এলো কোথে কে টিকেট! প্রকাশ করলাম না। বছরে দুবার যাই।

সময় মতো গিয়ে সিটে বসলাম। আমার খুব শখ ছিল হার্ডিং বৃজ দেখার। ঘুমালাম না, জানালা খুলে তাকিয়ে থাকলাম।

চাদনি রাত বাইরের মুগ্ধতার আয়েশে হারিয়ে গেলাম আমার জীবনের মাঝে।

নদী আমাকে নতুন জিনিস দেখাবে। চাদের আলোতে সব দিনের মতো ফর্শা। আমরা বাড়ির পাশে আম বাগানে চলে গেলাম। গিয়ে বললাম, কি দেখাবি দেখা। আমাকে পড়ার টেবিলে না দেখলে ডাকাডাকি করবে।

ঠিক আছে, চলে যাই।

চুপচাপ দাড়িয়ে রইলাম।

আমাকে তোর ভালো লাগে?

মাথা কাত করলাম।

আমি যা বলবো তুই তা করবি। আমাকে ধর।

না, কেউ দেখলে।

কেউ দেখবে না।

আমাকে আদর কর।

চঞ্চল হয়ে গেলাম। নদীর বুক, ঠোট আমার হাতের স্পর্শে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আস্তে ওর জামাটা উপরে ওঠালাম।

আমার মনে হলো আকাশ থেকে দুইটি চাদের টুকরো যেন ওর বুকে বসেছে। আমার নরম ঠোট ওই দুটির মাঝে ডুবিয়ে দিলাম। একটা হাত ঢুকিয়ে দিলাম ইজারা প্যান্টের ফাক দিয়ে, কচি দুর্বা যেন শিশির সিক্ত। পাগল হয়ে গেলাম। আমি ফিতা টান দিচ্ছি।

নদী বললো, আজ না। এটুকু আরেক দিন দেখাবো।

আর দেখা হয়নি বাকিটুকু।

পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো। পাশের সহযাত্রীকে বললাম, একটু দেখবেন ভাই।

বাথরুমে ঢুকে বসে বাথরুম করা খুবই কষ্ট, তারপরও বসলাম। সামনের একটা লেখায় চোখ পড়লো। পেছনে তাকান। কৌতুহল বসে তাকালাম। ডানে তাকান, বামে তাকান, উপরে তাকান, এখন তাকিয়ে থাকুন, হাসলাম নিজের বোকামির জন্য।

দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ থেকে

সেই মেয়েটি

- জাকির আকন্দ

এমন ঘটনা আমার জীবনে আর কোনোদিন ঘটেনি। মেয়েটির মনে যে কি ছিল আজো বুঝে উঠতে পারিনি।

সেদিন বলাকা এক্সপ্রেস ট্রেনে ময়মনসিংহ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। যথানিয়মে করিৎকর্মা ছেলের পরিচয় রেখে সিট দখল করেই বসেছি। অবশ্য ব্যাগটা একটু বেকায়দাভাবে ছুড়ে মেরেছিলাম। ব্যাগের ভেতর বই ছিল। যে ছেলেটা সিটে বসা ছিল তার নাক বরাবর গিয়ে বই লাগায় সে না নেমে আমার প্রতীক্ষা করছিল। কেন করছিল বুঝতেই পারছেন, বলা বাহুল্য। আমি উপরে উঠে গফরগাও যাবো বলতেই সব ঠাণ্ডা। যদিও বাড়ি ওরই গফরগাও, আমার নয়। আমি যাবো আরো সামনে শ্রীপুর। আর কিছু না বলে চলে গেল। গফরগাওয়ের লোক কথাটার মধ্যে এমনই একটা টনিক আছে। বলাকায় ভ্রমণ করতে হলে আপনাকে এটা জানতে হবো।

আমি বসেছিলাম একেবারে সামনের বগিতে। কিছু বগি থাকে যেগুলোর দরজা দুটো থাকে মাঝামাঝি। এটা ছিল সে রকম। দরজার বাম দিকের ছোট অংশটায় যাওয়ার জন্য যে সরু প্যাসেজ থাকে সেখানে জানালার দিকে পিঠ দিয়ে বসার মতো পাচজনের একটা সিট থাকে। আমি বসেছিলাম সেই সিটের শেষ মাথায়।

নিম্ন আয়ের কিছু মহিলা ওঠে বগির শেষমাথা থেকে মেঝেতে বসে পড়লো। ছোট অংশটা একেবারে সলিড জ্যাম হয়ে গেল। আর কারো এদিকে আসার উপায় রইলো না। ওই মহিলাদের মধ্যে কম বয়সী দুইটা মোটামুটি সুন্দরী মেয়ে ছিল। অপরিচ্ছন্ন হলেও একটি মেয়ের ফিগার ছিল আকর্ষণীয়। মেয়ে দুটো আমার সামনে পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়লো। বসেই যা শুরু করলো তাতেই সমস্ত লোকের দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হলো।

একজন আরেকজনকে বলে, এই তোর 'ই' দেখা যাচ্ছে। বলে ব্রা ঠিক করে দেয়, ওড়না ঠিক করে দেয়।

আসলে ঠিক করার নামে আরো বেঠিক করে দেয়। আর দুজন মিলে কি হাসাহাসি।

বড় মেয়েটি আমার হাটুতে পিঠ দিয়ে হেলান দিয়ে বসলো। আমি দুই হাটু ফাক করে বসলে ওর শরীরটা আমার দুই পায়ের ফাকে চলে এলো।

এ অবস্থায় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তারপরও মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি চাপলো। দুই পা দিয়ে দুই দিক থেকে ওর শরীরে চাপ দিলাম।

মেয়েটি মনে হয় মজাই পেল। ও নিজেকে আরো পেছনে ঠেলতে লাগলো। এবার ওর মাথা আমার দুই উরুর মাঝখানে চলে এলো।

দুবার মৃদু স্বরে বললাম সামনে সরে বসতে।
সামনে তো এগোলোই না, বরং এই কথা নিয়ে দুজন হাসাহাসি করতে লাগলো।
এদিকে আমার শরীর ঘেমে উঠতে লাগলো। ট্রেন ভর্তি মানুষ।
সবার সামনেই মেয়েটি এ রকম করছে। আপত্তিকর কিছু দেখলে লোকজন তো আমাকেই ঝাড়বে। যাহোক চুপ করে বসে রইলাম।
এদিকে দুই পায়ের ফাকে নরম ভরাট শরীরের ভীষণ সেক্সি মেয়ে বসে আছে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই সমস্যা হয়ে দাড়ালো। বয়সের দোষে মাঝে মধ্যে দুই হাটু দিয়ে চাপ দিই।
মেয়েটি মজা পায়।
আর আমার শরীর গরম হতে থাকে।
ওর শরীর আর আমার হাটু–উরু যেখানে–যেখানে স্পর্শ করেছিল সেখানে আগুন গরম হতে থাকে।
ও আরো পিছিয়ে বসে।
আমার পুরুষাঙ্গ ওর পিঠ স্পর্শ করে রইলো। ও নিজেকে আরো পেছনে ঠেলে আর আমি সামনের দিকে। ওর পিঠে চাপ আরো বাড়ে। ভাবখানা এমন দাড়ালো যেন ওর পিঠ ভেদ করে ঢুকে যাবে।
এরপর লোকজনের দৃষ্টি থেকে বাচার জন্য যতোটা সম্ভব পিছিয়ে বসে রইলাম শঙ্কিত মনে।
ঘণ্টা খানেক পর ট্রেন গফরগাও স্টেশনে এলো। এই স্টেশনে এলে ট্রেনের অর্ধেকের বেশি লোক নেমে যায়। আবার উঠেও যতো নামে তারচেয়ে বেশি। সুতরাং এখানে একটা ভয়ংকর হুড়োহুড়ি লাগবেই।
ট্রেনের লোক যখন নামার জন্য ব্যস্ততা দেখাতে শুরু করলো, মেয়েটা উঠে দাড়ালো।
আগেই বলেছি, বসেছিলাম জানালার দিকে পিঠ দিয়ে লম্বা বেঞ্চে।
হঠাৎ মেয়েটা আমার ওপর দিকে ঝুকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। ঝুকে থাকায় ওর জামার ভেতর দিয়ে বুকের প্রায় সবটা দেখা যেতে লাগলো।
আমার সারা শরীর উত্তেজিত হয়ে উঠলো। মনে হলো নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। ইচ্ছা করছিল এক্ষুণি ওকে জাপটে ধরে ফেলি। ওর ঝুলন্ত বুক দুটো আমার মুখের থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। দেখবো না দেখবো না করে চোখ অন্যদিকে সরিয়ে নিয়েও আবার বুকের দিকেই তাকিয়ে রইলাম।
মেয়েটাও সরছে না।
এ সময় ঝাকি দিয়ে ট্রেনটা পুরোপুরি থেমে গেল। ঝাকিতে মেয়েটা পড়ে যায় যায় অবস্থায় আমার মুখের সঙ্গে ওর নরম বুকের একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল। আর থাকতে পারলাম না। হাতটা যেন স্প্রিংয়ের মতো ওর বুকে ওঠে গেল।
এমন নরম জিনিসের স্পর্শ আগে কখনো পাইনি। ওর শরীরের আড়াল থাকায় ট্রেনের ভেতরের কেউ দেখতে পায়নি। আর বাইরের লোকজন তো ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি করছে। আমার হাত ওর বুকে সক্রিয় হলো। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে।
এরপর আমি হাত সরিয়ে নেয়ার আগেই মেয়েটি যা করলো তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ততোক্ষণে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ও আমার হাত ধরে বুক থেকে সরিয়ে ওর নাভির নিচে দুই উরুর সঙ্গমস্থলে চেপে ধরলো। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দাড়ালো।
ও খুব জোরের সঙ্গে ধরেছিল। কিন্তু আমি ঝট করে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। আমার মেরুদণ্ড দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। মেয়েটার উদ্দেশ্য কি? ট্রেনের লোকদের হাতে মার খাওয়ানো নাকি, ফাদে ফেলে মজা দেখা?
অবশ্য কেউ খেয়াল করেনি বা করলেও কিছু বলতে সাহস পায়নি।
ইতিমধ্যে ট্রেন স্টেশন ছেড়ে বের হয়ে এসেছে। আমার পাশের সিট খালি হওয়ায় ও আমার পাশেই ডান দিকে বসলো।

আমি ঠাণ্ডা মেরে বসে রইলাম। মেয়েটার দুষ্টুমিতে সাড়া দিতে গিয়ে কোন বিপদে পড়ি কেন জানে! এভাবে বেশ অনেকক্ষণ চলে গেল।

এর মধ্যে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশে মেঘ থাকায় ট্রেনের ভেতর এই শেষ বিকেলেই আবছা অন্ধকার। বলাকা ট্রেনে কোনো লাইটের ব্যবস্থা নেই।

কিছুক্ষণ পর মেয়েটার হাত এবার সক্রিয় হলো। আমার উরুর ওপর হাত বোলাতে লাগলো। মাঝে মধ্যে হাতটা আমার উরু ছেড়ে বিশেষ জায়গায় চলে যেতে লাগলো।

বয়সের দোষে আমিও তাই করলাম। দেখি সম্মতি আছে। ডান হাতে গলা জড়িয়ে ধরে হাতটা জামার মধ্যে ঢোকানোর ভান করলাম। একটু বাদে ঢুকিয়েই দিলাম। কোনো প্রতিবাদ এলো না, বরং আমার উরু চাপড়ে দিল।

সাহস পেয়ে বাম হাতটাও এপাশ দিয়ে ওর বাম বুকে চেপে ধরলাম। পুরো শরীর যেন আগুন হয়ে গেল। কান দিয়ে গরম বাতাস বেরুতে লাগলো। পুরো শরীর যেন অবশ হয়ে যেতে লাগলো। প্রচণ্ড উত্তেজনায় হাত পা কাপছিল। নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। ওকে আরো জোরে চেপে ধরলাম। ইচ্ছা করছিল নিজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলি। সেও যেন গলে যেতে লাগলো।

কাছাকাছি দুই একজন অন্ধকারে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল কি হচ্ছে। আমরা একটুও কথা বলিনি। ট্রেন এ সময় চলছিল কাওরাইদ স্টেশন পার হয়ে সাতখামাইর-এর দিকে। এখানে মাঝে মধ্যেই টিলা কেটে রেললাইন করায় দুপাশে উচু জায়গা, মাঝখানে রেল চলছে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়। এখানে এলে ট্রেনের ভেতর অন্ধকার বেড়ে জমাট নিকষ কালো অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাই ট্রেনের ভেতর কেউ আমাদের দেখতে পায়নি।

ওই অবস্থায়ই নিচু হয়ে ওর বাম কানের গোড়ায় ঘাড়ে একটু চুমু খেলাম।

ও কাতর শব্দ করে উঠলো।

বুঝলাম উত্তেজনা বেশি হয়ে যাচ্ছে। দুজন ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছি।

এ সময় এক হকার এসে যাওয়ায় ছেড়ে দিতে হলো। হকারের কাছে কুপি থাকে। সাতখামাইর আসা পর্যন্ত আর সুযোগ পেলাম না।

এই স্টেশন থেকে ছাড়ার পর হাত দুটো আবার চলে গেল ওর বুকে। এই অভিজ্ঞতা জীবনে ভুলবো না। জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। স্থানকাল ভুলে ওর নরম বুক দুটো নিয়েই খেলা করতে লাগলাম। বাকিটা পথ এভাবেই কাটলো।

সাতখামাইর থেকে শ্রীপুর আসতে দশ মিনিটেও লাগে না। সময়টা যেন এক সেকেন্ডে শেষ হয়ে গেল। মনে হচ্ছিল এই ভ্রমণ যদি অনন্তকাল চলতো তাহলে কি ভালোই না হতো। এই একটি দিন ছাড়া ট্রেন ভ্রমণকে দীর্ঘায়িত করা কামনা কোনোদিন মনে আসেনি।

আমার নামার সময় হয়ে গেলে কোনো কথা না বলে ওঠে এলাম।

সেও কোনো কথা বললো না।

ট্রেন থেকে নেমে জানালা দিয়ে তাকালাম।

স্টেশনের ম্লান আলোয় ওকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম।

ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত আমিও নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম।

ট্রেন ওকে নিয়ে ঢাকার দিকে চলতে লাগলো।

আমিও বাড়ির পথ ধরলাম। রাত হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে!

সানকিপাড়া, ময়মনসিংহ থেকে

রক্তের ডাক

- হিরা

হঠাৎ করেই জানতে পারলাম, আমার বড় ভাই কভার ভ্যানের ছাদ থেকে পরে হাত ভেঙে ফেলেছে। ই-মেইলটি পড়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তার ব্যথার কথা কল্পনা করে, বুক ঠেলে কান্না আসছিল। ব্রাউজিং সেন্টার থেকে বের হয়ে কিভাবে যে বাসায় পৌছেছি তা একমাত্র আল্লাহ জানে!

আমি সে সময় ইনডিয়ার কর্নাটক প্রদেশের রাজধানী ব্যাংগালোরে পড়ালেখা করছি কমপিউটার সায়েন্স নিয়ে। ভাইকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম বাংলাদেশ যাবো। সম্বল ছিল সাতশ রুপি। পুলিশ কমিশনার অফিসে গিয়ে বাংলাদেশ যাবার অনুমতি নিলাম। সব দৌড়-ঝাপ শেষ করলাম পায়ে হেটে। ব্যাংগালোরের ইয়াশানপুর রেলস্টেশনে এলাম নির্ধারিত দিনে ছোট একটি ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে হ্যারল্ড রবিন্স-এর *দি স্ট্রেঞ্জার* বইটি নিলাম সঙ্গী হিসেবে। বিকাল পৌনে পাচটায় ট্রেন ছাড়লো। উঠে পড়লাম আল্লাহর নাম নিয়ে জেনারেল কম্পার্টমেন্টে টিকেট না কেটে।

জেনারেল কম্পার্টমেন্টে তেমন মানুষ ছিল না। আমি যেখানে বসেছিলাম সেই বগিতে মাদ্রাজের এক গরীব পরিবার ছিল। তারা যাবে অন্ধ্র প্রদেশের কোনো এক জায়গায়। চল্লিশ ঘণ্টা এই ট্রেনে থাকতে হবে। বুক টিপটিপ করছিল। এতোটা সময় পাড়ি দিতে হবে, টিকেট নেই সঙ্গে। যেকোনো জায়গায় ধরা পড়লে টিটি নামিয়ে দেবেন, জেলেও দিতে পারেন। নানান রকম চিন্তা জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। মনটা শান্ত করেছিলাম বইটা চোখের সামনে তুলে ধরে। সামনে বসা মাদ্রাজি মহিলা শাড়ি দিয়ে দুই সিটের মাঝে বেধে দোলনা বানিয়ে তাতে কোলের শিশুটিকে শুইয়ে রেখেছেন।

বুঝতে পারছিলেন আমি ভিনদেশি।

রাতে খাবার সময় জিজ্ঞাসা করলেন, *উটাইতা* অর্থাৎ খেয়েছো?

সম্মতি সূচক দুদিকে মাথা নাড়লাম। বাংলাদেশি মানুষ হলে ভাবতো না বলেছি। কিন্তু এরা অর্থাৎ দক্ষিণ ইনডিয়ায় এরা এভাবে মাথা নাড়ানোকে হ্যা বোঝে।

আরো কিছু বলতেই বললাম, *কানাড়া গতিল্লা* অর্থাৎ কানাড়া ভাষা জানি না।

আলাপ থেমে গেল। হু হু করে ট্রেন ছুটে চলছে। প্রতিটি সময় যাচ্ছিল আর ভাবছিলাম বাংলাদেশের পথে এগোচ্ছি।

রাতে শেষে এক দঙ্গল জেলে উঠলো বিশাল সব ডেকচি নিয়ে। কলকাতা থেকে তারা আসে দক্ষিণের বিভিন্ন স্থানে মাছ সরবরাহ করার জন্যে। যেহেতু তারা বাংলাভাষী, তাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলো। প্লেইং কার্ড খেললাম। তাদের একজন বিভিন্ন অভিনয় করে দেখালো। দিনের তিনবেলার খাবার তারা তিন স্টেশন থেকে সংগ্রহ করলো। যারা দিয়ে যায় খাবার, তারা আগে থেকেই জানতো ওরা (জেলেরা) আসছে।

রাতে জোর করে খাওয়ালো রুটি, ভাজি, ঘরে বানানো কেক।

ওদের সিগারেট দিলাম, গল্পের ফাকে তাদের সঙ্গে পাতার বিড়ি টানলাম, খুব সহজেই নিভে যায়, ক্রমান্বয়ে পাফ করতে হয়।

এক স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল। শুনেছিলাম অনেকক্ষণ দাড়াবে এখানে ট্রেন। বোতলে খাবার পানি ঢুকিয়ে একটা হোটেলে ঢুকে খাচ্ছি। হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে দিল, দৌড়ে দৌড়ে কোনো রকমে ট্রেনে চাপলাম। কিন্তু তা ছিল স্লিপার কম্পার্টমেন্ট। কপাল বলতে হবে, টিকেট চেকার পেয়ে বসলো।

বললেন, শো মি ইওর টিকেট।

বললাম, আই কেপ্ট মাই টিকেট, ইন মাই লাগেজ।

তিনি বললেন, হুইচ ওয়ান ইজ ইওর কম্পার্টমেন্ট।

বললাম, এস ফোর, সিট নাম্বার সিক্সটি–ফাইভ।

তিনি বললেন, গো অ্যান্ড সিট দেয়ার।

হাটা ধরলাম। চট করে টয়লেটে ঢুকে পড়লাম। অনেকক্ষণ পর বের হয়ে এলাম টয়লেট থেকে। ট্রেন থামতেই চলে গেলাম জেনারেলে।

রাত দশটা হবে তখন। এক দল হাই স্কুলের ছেলে উঠলো। ক্রিকেট খেলতে এসেছিল, যাবে খড়্গপুর। ওদের ভাষাও বাংলা। কিন্তু একজনের বই পড়ে দেখলাম বর্ণমালা ও বানানে মিল নেই আমাদের বাংলার সঙ্গে।

এক সময় খড়্গপুর এলো নেমে গেল ওরা।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্মটি হচ্ছে খড়্গপুর প্ল্যাটফর্ম।

কোনো বিপদ ছাড়াই ভোর রাতে হাওড়া জাংশনে নামলাম। জেলে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্দেশ্যে বাসে চাপলাম। এই লোকাল ট্রেনগুলোতে সাধারণত টিকেট চেক হয় না। যেহেতু টাকা কম, তাই এমনিই উঠে পড়লাম।

হাওড়া স্টেশনে নেমে বর্ডারের উদ্দেশ্যে টেকসিতে উঠলাম।

দুর্গাপূজার চাদার জন্য এক দঙ্গল ছেলে ধরলো, যদিও দুর্গাপূজার তখনো দুই মাস বাকি। যারা বাংলাদেশ থেকে ইনডিয়াতে আসেন তারা আশা করি জানেন এরা কেমন বিরক্ত করে।

বললো, টাকা দাও।

কেন জিজ্ঞাসা করতেই বললো, পূজা হবে, টাকা দাও।

বললাম, দেবো না।

বললো, না দিলে কি করবো বুঝতেই পারছো।

ট্যাকসি থেকে নেমে বললাম, কি করবে?

বললো, মারবো।

বললাম, মারো।

অন্য যাত্রীদের বলতেই ওরাও বললো, দেবো না। তারাও ছিল বাংলাদেশি যাত্রী। কেমন যেন একজোট অনুভব হচ্ছিল।

বর্ডারে রুপি এক্সচেঞ্জ করে টাকা নিলাম।

ইনডিয়ান কাস্টমস অফিসার বললেন, পঞ্চাশ টাকা দাও, তা না হলে ব্যাগ রেখে দেবো।

বললাম, রেখে দেন। আমার কাছে সাড়ে চারশ টাকা আছে তা দিয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যেতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ওরাও ছেড়ে দিল।

বাংলাদেশে ঢুকলাম। মন আনন্দে ভরে উঠলো। বুকের মাঝে একটাই উপলব্ধি হচ্ছিল, ভাইয়া, আমি আসছি।

হালিশহর, চট্টগ্রাম থেকে

চড়া বেশি

- মোহাম্মদ আবদুল আজিম চৌধুরী

বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি। কারণ এ ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য যাতায়াতের বাহন হিসেবে ট্রেন ব্যবহৃত হয়। এ ট্রেন *শাটল ট্রেন* – Shuttle Train নামে পরিচিত। স্বল্প ব্যবধানে চলাচলকারী ট্রেনকে *শাটল ট্রেন* বলা হয়।

চট্টগ্রাম শহর থেকে বিশ বাইশ কিলোমিটার দূরে পাহাড় ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে এ ইউনিভার্সিটি অবস্থিত। এ দূরত্ব অতিক্রম করার বাহন হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য ট্রেনের ব্যবহার। অবশ্য শিক্ষক, কর্মকর্তাদের জন্য বাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

এই শাটল ট্রেন ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের হাজারো সুখ–দুঃখ, হাসি–কান্না, আনন্দ–বেদনা, রাগ–অনুরাগ, প্রেম–প্রীতির অনেক স্মৃতি মেশানো এক বাহন। বাংলাদেশে জরাজীর্ণ মন্থর গতিতে চলা ট্রেনের যদিও কোনো কদর নেই তবুও জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের বাহন হিসেবে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের কাছে এর কদর অপরিসীম। এ শাটল ট্রেনে চড়ার যে আনন্দ, যে অনুভূতি তা বর্ণনাতীত।

চট্টগ্রাম শহরের বটতলী স্টেশন থেকে এই ট্রেনের যাত্রা শুরু। ক্রমান্বয়ে এ ট্রেন এসে থামে ঝাউতলা, ষোলশহর, ক্যান্টনমেন্ট, চৌধুরীহাট, ফতেয়াবাদে। গন্তব্যের সমাপ্তি ঘটে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি স্টেশনে। বাংলাদেশের এককমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী রেলস্টেশন *চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি রেলস্টেশন*। কারণ এ রেলস্টেশনে কোনো স্টেশন বিল্ডিং, স্টেশন মাস্টার, কাউন্টার ও কোনো দাফতরিক কাজকর্ম নেই। বাজে না কোনো গার্ডের সেই অপূর্ব মূর্চ্ছনায় টং টং ঘণ্টা।

মোট দুইটি ট্রেন দিনে পাচবার আপ (UP) ও ডাউন (DOWN) করে থাকে। ভোরের সূর্যোদয়ের সঙ্গে বটতলী স্টেশন ছাত্রছাত্রীদের কলরবে মেতে ওঠে। তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে ওঠে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। ছাত্রছাত্রীদের কলতানে মুখরিত স্টেশন। ক্রমান্বয়ে ঘড়ির কাটা সাতটা বিশ–এর দিকে এগিয়ে চলে, ছাত্রছাত্রীদের কলরবে মেতে ওঠে চারদিক। হুশ হুশ শব্দে এগিয়ে চলে ট্রেন। নগরীর কেন্দ্রস্থল থেকে সরে ট্রেন ক্রমান্বয়ে শহরতলী এসে পৌছায়। দেওয়ানহাট ওভারবৃজের নিচ দিয়ে কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টি ভেদ করে এগিয়ে চলে শাটল ট্রেন। ঝাউতলা বস্তি এলাকার দৃশ্য অবলোকন করে ছাত্রছাত্রীরা বিরক্ত মনে স্থানুর মতো নিষ্ক্রিয় থাকে। বিত্তশালী ছাত্রছাত্রীরা বস্তিবাসী জনসাধারণের দুঃখ–দুর্দশা দেখে মর্মাহত হয়। এ দৃশ্য শুধু ঝাউতলা নয়, ষোলশহর স্টেশনের অনতিদূরে রৌফাবাদ বিহারি কলোনিতেও দেখা যায়।

ঝাউতলা স্টেশনের পর খুলশী বিলাসবহুল আবাসিক এলাকার দৃশ্য পূর্বের বস্তির দৃশ্যকে যেন পরিহাস করে। কেমন নিষ্ঠুর অর্থনৈতিক বৈষম্য! খুলশীর পর পলিটেকনিক হল্টে এসে ট্রেন থামে কিছুক্ষণ। এ হল্টে পলিটেকনিকের ছাত্রদের ওঠা–নামা নিয়ে চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সঙ্গে বহুবার বাদানুবাদ, সংঘর্ষও ঘটেছে। তারপর ষোলশহর এসে থামে ট্রেন। এ স্টেশনে বহু ছাত্রছাত্রী ওঠা–নামা করে। শহরের একপ্রান্তে বিধায় শহর ও শহরতলীর বহু ছাত্রছাত্রীর আবাসস্থলও কাছাকাছি। তাই এ স্টেশনে ওঠা–নামায় প্রচণ্ড ভিড় দেখা যায়। ষোলশহর থেকে পূর্বোক্ত বস্তি এলাকা অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে নাছিরাবাদ শিল্প এলাকা ও এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ জুটমিল *আমিন জুটমিল*–এর মধ্য দিয়ে চলে যায় ধীর গতিতে। এ মিলের শ্রমিকেরা ট্রেনে আরোহী ছাত্রছাত্রীদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। যদিও অন্যান্য স্থানের লোকেরাও একনজর ট্রেনে আরোহী ছাত্রছাত্রীদের দেখার চেষ্টা করে থাকে তবুও কারো বুঝতে বাকি থাকে না, এই রহস্যময় পৃথিবীর রহস্যময়ী সৃষ্টি নারীর সৌন্দর্য তারা দেখে। যদিও নারী দেখলেই উৎসুক হয়ে দেখা অনেক পুরুষের স্বভাবধর্ম তবুও আমিন জুটমিল শ্রমিকদের দৃষ্টি অনেক ছাত্রছাত্রীদের বিব্রত করে। আর তা দৃষ্টিকটুও ঠেকে।

পরবর্তীকালে ট্রেন অক্সিজেন ক্রসিং অতিক্রম করে সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশ করে। সেনাবাহিনীর নৈমিত্তিক কার্যাবলী চোখে পড়ে ছাত্রদের। পরিশ্রমী সৈনিকদের ঘর্মাক্ত দেহে পদচারণা ও প্যারেডের দৃশ্য এক নৈমিত্তিক ব্যাপার। কদাচিৎ কোনো কোনো কৌতূহলী সৈনিক ও অফিসার (জুনিয়র)–দের হাত নেড়ে ছাত্রীদের সম্ভাষণ জানাতে দেখা যায়।

ইউনিভার্সিটির রসিক ছাত্রীরাও কম যায় না। তারাও পাল্টা হাত নেড়ে সৈনিকদের কৌতূহলী মনকে অনুপ্রাণিত করে।

ট্রেনের অভ্যন্তরে মুখরিত কম্পার্টমেন্ট তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। আনন্দ, রোমাঞ্চ, শিহরণে পুলকিত ছাত্রছাত্রীরা। এক ঘণ্টার এই ভ্রমণ।

শাটল ট্রেনের বগিতে আরোহণের একটা সূক্ষ্ম কৌশল আছে। বগির মধ্যে কতোগুলো বগি লম্বালম্বি এক পাশে হেলান দিয়ে দাড়ানোর স্থান থাকে। তাই এ বগিতে দাড়িয়ে গেলে তেমন অসুবিধা হয় না। তবে এ বগিগুলো কিছুটা বদ্ধ টাইপের, প্রবেশপথও সংকীর্ণ। আর কতোগুলো বগি খোলামেলা ও সিট উন্নতমানের। এতে মুক্ত আবহাওয়া পাওয়া যায়। তবে এতে প্রবেশ মুখের বিস্তৃত স্থান ছাড়া সিটের পাশে দাড়ানো সুবিধাজনক নয়। অনেকে গানের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক নির্দিষ্ট বিভিন্ন বগিতে ওঠে গানের অপূর্ব মূর্চ্ছনায় নিজেকে তরঙ্গায়িত করার জন্য।

সবচেয়ে বড় কৌশলটা হলো, যে সমস্ত ছাত্র পথিমধ্যে বিভিন্ন স্টেশন থেকে ওঠে তাদেরকেও প্ল্যাটফর্মের যেখানে ভিড় কম সেখানে দাড়িয়ে ভিড় এড়াতে হয়। ট্রেনের সামনের দিকের বগিগুলোতে উঠলে ইউনিভার্সিটি স্টেশনে নেমে তাড়াতাড়ি বাসে ওঠা যায় দূরত্ব কম থাকে বলে। তবে ফিরতি ট্রেনে এরা একদম পেছনের বগিতে পড়ে যায়। ট্রেনে উঠতে যে ভিড় দেখা যায় তাকে বিরক্তিকর মনে হয়।

রাজনীতি হচ্ছে ছাত্রজীবনের অন্যতম প্রধান বিষয়। এই রাজনীতি চর্চা শাটল ট্রেনকে ঘিরেই প্রবাহিত হতে দেখা যায় চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে। স্টেশন চত্বরগুলো রাজনীতির মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়াটা এক ধ্রুবসত্য। স্টেশনের ফাকা চত্বরে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীদের তার আদর্শ তথা মতবাদের বুলি আওড়াতে দেখা যায়। একটা বিশ মিনিটের শাটল ট্রেন ছাড়ার আগে প্রায়ই মিছিল-মিটিং চলতে দেখা যায়। এ মিছিল-মিটিংকে ঘিরে অনেক সময় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কদাচিৎ সংঘর্ষও ছড়িয়ে পড়ে। বটতলী স্টেশনে হরতাল ও ধর্মঘটের সময় ট্রেন আটকানো এক স্বাভাবিক ঘটনা। তবে ট্রেনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচারণা মোটেই নেই। কেউ কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখে না। কিন্তু বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন প্রোগ্রামে চাদা সংগ্রহ করতে দেখা যায়। বিভিন্ন সংগঠনের পোস্টারে প্রায় সময় বগি রাঙা সাজে সজ্জিত থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইসুতে অনেক সময় শাটল ট্রেন ভাংচুর ও স্টেশনে অগ্নিসংযোগ হতে দেখা যায়। এতে রেল কর্তৃপক্ষের প্রতি ছাত্রদের ক্ষোভের মাত্রারও প্রকাশ ঘটে। মাঝে মধ্যে বগি লাইনচ্যুত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আহত হওয়ার ঘটনাও ঘটে থাকে। একে অপরের প্রতি সহানুভূতির বহিঃপ্রকাশও ঘটে। বিভিন্ন জটিল রোগীর চিকিৎসার্থে ট্রেনে চাদা সংগ্রহে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মধ্যে এগিয়ে আসে।

এই আধুনিক বিশ্বের টিনএজার বয়সী ছেলেমেয়েদের ডেটিংয়ের এক অপূর্ব স্থান শাটল ট্রেন। নর-নারীর পবিত্র ভালোবাসা, হৃদয়ের আকুতি প্রকাশ পায় তাদের হৃদয় উজাড় করা কথার মাধ্যমে। শাটল ট্রেনেও অনেক কপোত-কপোতী তাদের হৃদয়ের হাজারো কথা, আশা, অন্তরের ব্যথা একে অন্যকে প্রকাশ করে।

গানের অপূর্ব চর্চা দৃষ্ট হয় চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি শাটল ট্রেনে। গ্রুপ বেধে সমস্বরে ট্রেনের বগি পেটাতে পেটাতে গান গায়। গানের কোনো নির্ধারিত সীমারেখা নেই। *ভাটিয়ালী, আধুনিক, রবীন্দ্র, নজরুল, ছায়াছবি, আঞ্চলিক, লোকসংগীত* প্রভৃতি গানের অপূর্ব সমাহার। তবে ব্যান্ড সংগীতের ব্যাপক চর্চা হয়ে থাকে। গ্রুপের একজন দলপতি দেখা যায়। তার নেতৃত্বে গানের প্রথম কলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা তার অনুসরণ করে। এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। তীব্র চিৎকার, তাললয়হীন গানের ছন্দে অনেকের নাভিশ্বাস উঠতে দেখা যায়।

দলবদ্ধভাবে গানের সুর তোলার জন্য গ্রুপিং আবশ্যক। সেই গ্রুপিংকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট বগিতে নির্দিষ্ট গ্রুপের আসর জমজমাট হয়ে ওঠে।

নিচে কতোগুলো গানের গ্রুপের নাম ও পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো।

এক. **ককপিট অ্যাসোসিয়েশন :** চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি শাটল ট্রেনের গানের জগতে এক প্রভাবশালী এই গ্রুপ। এ গ্রুপের সদস্যরা একটু প্রবীণ ও অভিজ্ঞতার ঝুলিটাও কিছুটা ভারী। তবে এদের জনপ্রিয়তা দিন দিন নিম্নগামী। সিট দখলের পরিকল্পনায় এরা ম্রিয়মাণ হলেও এদের বগি প্রায়ই নির্দিষ্ট থাকতে দেখা যায়। এদের কার্যক্রমে যদিও ভাটা বর্তমানে তবুও এরা ঝাড়া দিয়ে ওঠে সংগীতের আকুল আহ্বানে। এদের *গজল* প্রীতির কথা সবারই জানা। তাই গজলভক্তদের আনাগোনা এ গ্রুপেই বেশি। বয়সের ভারে এরা যদিও ম্রিয়মাণ তবুও এদের গানের আসর নিয়মিত জমজমাট হতে দেখা যায়। এমনকি এদের নিয়মিত সভা, আলোচনা, উৎসব ও প্রেস বৃফিং হয়ে থাকে। তবে তারুণ্যের অফুরান শক্তিতে অপরাপর গ্রুপের সঙ্গে পাল্লা দেয়াটা এদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

দুই. **খাইট্টা খা :** ট্রেনের গানের জগতে একটি তারুণ্যের প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা গ্রুপের নাম *খাইট্টা খা*। এদের গ্রুপের নামকরণের আলাদা একটা তাৎপর্য রয়েছে। পরিশ্রমই হচ্ছে এদের মূলনীতি। ফলে নামকরণের সার্থকরা শতভাগ দৃশ্যমান। সদস্য সংগ্রহ, গানের জগতে বিচরণ, বহুবিধ চাপাবাজিতে এদের পরিশ্রম ব্যয় হয়। নির্দিষ্ট বগিতে আরোহণ করে এরা সংগীতের ঢেউ তোলে। আধুনিক, ছায়াছবি, ব্যান্ডের গানের পাশাপাশি এদের নিজস্ব প্রোডাকশনের গানও গায়।

সবচেয়ে চমৎকার পরিবেশনা তাদের নিজস্ব প্রোডাকশনের গান। অভিনব ভঙ্গিতে হাতের তালু, আঙুল বা যেকোনো কাঠি দিয়ে তারা বগিতে বিট তোলে, অপূর্ব ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে। ড্রাম বাজানোর অদ্ভুত দৃশ্যে কেউ কেউ দুই চোখ বন্ধ করে এক কাল্পনিক জগতে প্রবেশ করে। এ ব্যাপারে সবাই স্বাধীন, যার যা খুশি ইচ্ছা করতে পারে। কেউ কারো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না। এদের আকাশ ছোয়া(?) জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে দুর্জনেরা বলে, *সইবো না এদের শায়েস্তা করতে হবে। কারণ জিনিস (?) সব এদের দখলে চলে যাচ্ছে এদের মোহে মুগ্ধ হয়। অনেককে বিরহের সাগরে ভাসাচ্ছে। হৃদয় শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে।* এসব হুমকি–ধামকি তাদের তৎপরতাকে স্তিমিত করতে পারছে না, এরা এদের মূলনীতিতে অটল।

তিন. **টর্পেডো :** নামে যদিও এদের অপূর্ব গতিময়তার পরিচয় পাওয়া যায় তবুও বাস্তবকার্যে মৃতপ্রায় এরা। পুরনো উদ্যোক্তাদের বিদায়ের ফলে নতুনরা শক্ত হাতে এর হাল ধরতে পারছে না। নতুনরা একে পুরনো ফর্মে নিয়ে আসতে পারবে বলে বিশ্বাসী। এদের নামের গতিময়তা চিন্তা করে এরা ট্রেনে গান ও স্লোগানকে ফার্স্ট করে চালাতো। টর্পেডো লেখা গেঞ্জি পরে এদের ট্রেনে আরোহণ করতে দেখা যায়। ইউভার্সিটির বিভিন্ন সড়কে এদের চিকাও মাঝে মধ্যে দেখা যায়। লাঠি দিয়ে বিট তোলাতে ট্রেনের বগি প্রায় এদের হাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। বর্তমানে এদের তৎপরতা ক্রমে বিলুপ্তির পথে।

চার. **কিরিঞ্চি :** অদ্ভুত নাম যেমন, তেমনি অদ্ভুত এদের তৎপরতা। চমৎকার স্লোগান এদের *নো মিটার নো ইঞ্চি উই আর কিরিঞ্চি*। কিরিঞ্চিগিরিতে এরা সিদ্ধহস্ত। এর কার্যক্রম ১৯৯৩–তেই শুরু হয় এবং সদস্য তারাই হবে যারা গিরিঙ্গিগিরিতে এক্সপার্ট। এদের গ্রুপের গঠনতন্ত্রে স্পস্টতই উল্লেখ আছে, *আমি এই মর্মে সদস্য হইতেছি যে, সর্বদা কিরিঞ্চিগিরি করিয়াই ইউনিভার্সিটি জীবন সমাপ্ত করিবো এবং এই লক্ষ্যে আমার জীবননাশ হলেও কোনোরূপ দ্বিধা আমার থাকিবে না*। এদের দলীয় স্লোগান দিয়ে এদের যাত্রা শুরু হয়। এদের বগি নির্ধারিত থাকে এবং একেকদিন একেকজন সিট রিজার্ভ করে থাকে। এই গ্রুপের সদস্যরা চুটকি ও চাপাবাজ। আবোল–তাবোল বকাবকিতে মাশাআল্লাহ এরা বড়ই দক্ষ। ইউনিভার্সিটির ঝুপড়িতে এদের পদচারণা সবিশেষ লক্ষণীয়। দেখলেই মনে হয় ডাইলের সঙ্গে এদের সবিশেষ আত্মীয়তা বিদ্যমান। তবে জনপ্রিয়তায় এদেরও কমতি নেই। জিনিসরাও এদের দখলে কম নেই।

গ্রুপগুলো প্রায় ১৯৯২, ১৯৯৩–এর দিকে গঠিত। এদের তৎপরতার পরিবর্তন ঘটলেও নতুন গ্রুপ ও কার্যক্রম ততোদিন বন্ধ হবে না যতোদিন পর্যন্ত ইউনিভার্সিটির শাটল ট্রেন বন্ধ হবে না।

আরেকটি ব্যাপার এ ট্রেনে সবিশেষ উল্লেখ্য, অন্যান্য লোকাল ও মেইল ট্রেনের মতো এ ট্রেনে টয়লেট থাকলেও এই টয়লেটগুলো সিল গালা করে দেয়া হয়েছে। এ বন্ধের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকে জেনেছেন, ট্রেন স্টেশনে অবস্থানকালীন টোকাইরা এর অপব্যবহার করে একে আবর্জনা ও দুর্গন্ধময় করে তোলে।

বাংলাদেশের অন্যতম ইউনিভার্সিটির তুলনায় চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রবাদ বিদ্যমান। সেটা হলো *চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে পড়ার চেয়ে চড়া বেশি*। ফ্যাকাল্টি বাস বাদ দিয়ে ট্রেনের চড়া হিসাব করলেই এ প্রবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করা যায়। এমনকি বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় এ ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘপথ রেল ভ্রমণ করে থাকে। দৈনিক যদি দুই ঘণ্টা করে বছরে তিনশ ষাট দিনের মধ্যে দুইশ দিন ধরা হয় তাহলে চারশ ঘণ্টা এবং চার বছরের কোর্সকে যদি কমপক্ষে পাচ বছরে শেষ হবে ধরে নেয়া হয় তাহলে দুই হাজার ঘণ্টা রেল ভ্রমণ হচ্ছে। জীবনের এতো দীর্ঘ রেল ভ্রমণ কতোজনের ভাগ্যেই বা জোটে। যদিও বা জোটে তাহলে কি এ রকম আনন্দময় পরিবেশে স্বল্প মূল্যে সম্ভব?

এ ট্রেন যাতায়াত বাবদ ছাত্রদের কাছ থেকে বছরে এককালীন মাত্র পঞ্চাশ টাকা কর্তৃপক্ষ চার্জ করে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কালো থাবা ও অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং সেশন জটের দুর্বিষহ যন্ত্রণার চিন্তা সাময়িকভাবে লাঘব করে দিতে পারে শাটল ট্রেনের আনন্দময় ভ্রমণ।

চান্দাগাও, চট্টগ্রাম থেকে

ছাদে

- মোহাম্মদ সেলিম খন্দকার

জীবনে কোনোদিন ট্রেনে ভ্রমণ করিনি, করার প্রয়োজনও হয়নি। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি উপলক্ষে সম্প্রতি আমাকে ট্রেন ভ্রমণ করতে হয়েছে। যদিও এটি শর্ট জার্নি তবুও জীবনের প্রথম ট্রেন ভ্রমণ হিসেবে এটি আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

চট্টগ্রামের বটতলী স্টেশন থেকে ইউনিভার্সিটিগামী শাটল ট্রেন দিনে কয়েক দফা ছাড়ে। বিবিএ ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখের সকাল আটটা দশ মিনিটের ট্রেনে কোনো মতে চেপে উঠলাম। কিন্তু বসার জন্য কোনো সিট খালি পেলাম না। দাড়িয়ে থেকে সারাটা পথ জার্নি করলাম।

ঝাউতলা এবং ষোলশহর যাওয়ার পর ভিড়ের চাপ আরো বাড়লো। ঠিক মতো দাড়ানোও যাচ্ছিল না। ট্রেনের ছাদেও একই অবস্থা। ঘেমে শরীর একেবারে জবুথবু।

কয়েকজন সংগীত সাধক তাদের নিয়মিত কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। অন্য সময় হলে গান ভালো লাগতো। এই অবস্থায় সব বিষের মতো ঠেকলো।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত হাটহাজারি পৌছালাম। হাপ ছেড়ে বাচলাম। নেমে দেখি চারদিকে উৎসব আমেজ। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা ও সদস্যরা ফুলের পাপড়ি ছিটিয়ে আমাদের স্বাগত জানালো। মনটা ভালো হয়ে গেল। ভালোভাবে পরীক্ষা শেষ করলাম।

এবার ফেরার পালা। মূল ক্যাম্পাস থেকে ট্রেনের কাছে আসতে আসতে ট্রেন ভর্তি হয়ে গেল। কোনো বগিতে এতোটুকু জায়গাও খালি রাখেনি। অনেককে দেখলাম ছাদে চড়ে বসেছে। পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতা মনে করে আমিও ছাদে ওঠার সিদ্ধান্ত নিলাম। অনেক কষ্টে ছাদে উঠে বসলাম, বগির মতো ছাদেও টইটম্বুর অবস্থা।

কিছুক্ষণ পর ট্রেন ছাড়লো। ট্রেন দোলনার মতো দুলতে লাগলো।

আমার মনে একই সঙ্গে ভয় ও উত্তেজনা। ভয় পেয়ে সবাই একজন আরেকজনকে ধরে রাখলো।

কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ রইলো না। সবাই ভয়কে জয় করে স্বাভাবিক হলো। হলো গান, আনন্দ, হাসি।

ট্রেনের ছাদ থেকে অনেক কিছুই দেখা যায় যা বগির ভেতর থেকে দেখা যায় না। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের জমি, সারিবাধা পাহাড় দেখে কিছুটা আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লাম। গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠলাম *আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরি খেলা।*

পাহাড় ঘেষেই চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে সৈনিকভাইয়েরা নানান কাজে ব্যস্ত। আমরা তাদের অভিবাদন জানালাম।

তারাও আমাদের অভিবাদনের জবাব দিয়েছেন।

ছোট বাচ্চারা আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়াচ্ছে।

কোনো তরুণীকে দেখলেই সবাই চিৎকার করে ওঠে। আবার হিন্দুপাড়া দিয়ে যাওয়ার সময় সবাই উলু ধ্বনি দিয়ে উঠছে। এসব করতে করতে কখন যে শহরে এসে পৌছালাম তা টেরও পাইনি। যাওয়ার সময়ের সমস্ত তিক্ততা ভুলে গেলাম।

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে

মিলানের ট্রেন

- শফিউল আলম তরফদার

শিশুকালে আমাদের আনন্দের দিন ছিল বার্ষিক পরীক্ষার শেষে ট্রেনে করে লাকসাম, তারপর ট্রেন বদলিয়ে লাকসাম থেকে চাদপুরে যাওয়া। ট্রেনের নাম ছিল *উলকা*। মনে মনে চিন্তা করতাম বড় হলে ট্রেনের ড্রাইভারই হবো। এতো বড় গাড়িকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াটা তো চাট্টিখানি কথা না।

চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে আসার পর মা-বাবাসহ ঘোড়ার গাড়িতে করে মেহেদীবাগের বাসায় যাওয়ার কি যে মজা সেটা এখনো মনে হলে আনন্দে মনে ভরে যায়। কিন্তু ট্রেন ভ্রমণ করতে গিয়ে যে আতংঙ্কের মধ্যে পড়তে হতে পারে সেটা কখনোই চিন্তা করিনি।

প্রথম কলকাতা ভ্রমণে খড়গপুরে যাওয়ার জন্য হাওড়া রেলস্টেশনে যখন এলাম, আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে, এতো লাখ লাখ মানুষ কোথা থেকে আসছে। মানুষের ধাক্কায় কাঙ্ক্ষিত ট্রেন পাওয়া তো দূরের কথা, মানুষের স্রোতে পৈতৃক জানটাও চলে যাওয়ার উপক্রম। ইউনেস্কোর স্পনসর-এ এক মাসের প্রোগ্রামে খড়গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার ইচ্ছাটাও বাতিল করতে ইচ্ছা হলো, মনে হলো কলকাতাটা বেড়িয়েই চলে যাই। কিছুক্ষণ পর বুঝলাম যে, এক সঙ্গে দুই তিনটা ট্রেন আসাতেই এ রকম জনস্রোত সৃষ্টি হয়েছে। তবে আমার মনে হয়, বিশ্বের খুব কম সংখ্যক স্টেশনই আছে যেখানে হাওড়ার মতো লাখ লাখ লোক এক সঙ্গে ভ্রমণ করে আসছে।

রেল ভ্রমণে আমার জীবনের মধুর স্মৃতি একটিই।

আমার বাবা সদ্য প্রয়ান করেছেন। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের পর আমার বাবা আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা গিয়েছিলেন। যুদ্ধে আশুগঞ্জ বৃজটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। আমরা ট্রেনে আশুগঞ্জ পর্যন্ত গিয়ে নৌকা করে নদী পার হয়ে অপর পাড়ে ভৈরব থেকে আরেকটি ট্রেনে উঠেছিলাম। ছোট্ট বয়সে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম ভাঙা বৃজটির দিকে। সেটি যে মুক্তিযুদ্ধেরই একটি সাক্ষী, অল্প বয়সে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

১৯৯৫। ইটালিতে বিজ্ঞানের শহর ট্রিয়েস্ট-এ গিয়েছিলাম আমার স্কুলে যোগদানের জন্য। বিমানের টিকেট থাকাতে রোম থেকে ট্রিয়েস্টে রেলে যাওয়া সম্ভব হয়নি। হঠাৎ বিশেষ এক কাজে মিলানে যেতে হবে এবং যেতে হবে ট্রেনেই। ইওরোপে ট্রেনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার জন্য রেলপথকে বেছে নিয়েছিলাম।

আমার স্যারসহ ট্রিয়েস্ট রেলস্টেশনে পৌছালাম রাতের ট্রেন ধরার জন্য। প্রায় হুবহু চট্টগ্রাম স্টেশনের মতো রেলস্টেশনটি। মিলানগামী ট্রেন ধরার জন্য যখন প্ল্যাটফর্মে গেলাম তখন দেখি একটা লাইনে ট্রেন দাড়িয়ে আছে সোফিয়া (বুলগারিয়া)গামী, আরেকটি লাইনে দাড়িয়ে আছে প্যারিসগামী ট্রেন।

ভুলে ট্রেন এদিক ওদিক হলে সোজা প্যারিস। শেষে দেখেশুনে মিলানগামী ট্রেনে উঠলাম। রাত হওয়াতে ইটালির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার সুযোগ হয়নি। ভোর রাতে ট্রেনটি মিলান স্টেশনে এসে পৌছালো।

স্টেশনের অবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক। কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে আলাদা করার কোনো উপায় নেই। শ শ মানুষ স্টেশনে ঘুমিয়ে আছে অর্থাৎ তাদের কোনো বাড়িঘর নেই, স্টেশনেই রাত কাটাচ্ছে।

আমার এক বন্ধু ইটালিতে আসতে চায়। ইটালিতে যাওয়ার সময় সে আমাকে অনুরোধ করেছিল ওই দেশের চাকরির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খোজখবর নেয়ার জন্য।

আমি যেখানে দাড়িয়েছিলাম সেখান থেকে এক ফিট দূরে শাদা চামড়ার একজন লোক ঘুমাচ্ছিল। যার উচ্চতা হবে সাড়ে ছয় ফিট। জিনসের শার্ট, প্যান্ট, হাই হিল জুতা। আমার হঠাৎ ইচ্ছা হলো এই লোকটার দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করে আমার বন্ধুকে দেখানোর জন্য যার উচ্চতা পাচ ফিটও নয়। উদ্দেশ্য একটাই, চাকরির বাজার সম্বন্ধে তাকে ধারণা দেয়া।

ক্যামেরা বের করতে না করতেই চোখের পলকে এক কালো আদমি হাজির, কিছু টাকা দাও। আমি ক্ষুধার্ত। আসলে সে ছিল ছিনতাইকারী। কোনো মতে লোকটা কাছ থেকে সরে আসার পর দেখলাম হঠাৎ সে আরেকজনের মানিব্যাগ ছিনতাই করে ভৌ দৌড় দিল।

মিলানের মতো আধুনিক শহরে এই দৃশ্য বেমানান।

আতঙ্কে আমরা দুজন ভোর হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবেশধারী পুলিশ টহল দেয়া শুরু করলো। ভোজবাজির মতো ছিনতাইকারী এবং ভবঘুরেরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সারা দিন মিলানে কাটানোর পর বিকেলের দিকে স্টেশনে এলাম। মিলান থেকে ভেনিস। তারপর ট্রেন বদলিয়ে ট্রিয়েস্ট যেতে হবে।

ভেনিস স্টেশনে এক ঘণ্টার মতো বসেছিলাম ট্রেন ধরার জন্য। প্ল্যাটফর্মে আছে ইলেকট্রিকাল ডিজিটাল ঘড়ি। এক ঘণ্টার মধ্যে সাত আটটা ট্রেন থামলো। ঘড়ি নির্দেশ করছে ছয়টা বত্রিশ মিনিট পরবর্তী ট্রেনটি আসার। ঠিক ছয়টা বত্রিশ মিনিট হলেই ঝিক ঝিক আওয়াজ আসছে। এক মিনিটেরও কোনো দেরি নেই।

আজ এই লেখা যখন লিখছি তার একদিন আগে আমার ওই স্যার ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যখন আসেন তখন ঘড়ির কাটা টিক রাত একটা চল্লিশ মিনিট। সকালে মালবাহী গাড়ি লাইনচ্যুত হওয়াতে বাংলাদেশের সবচেয়ে ভালো এক্সপ্রেস ট্রেন *সুবর্ণা* নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় চার ঘণ্টা পর গন্তব্যস্থলে পৌছে।

ইওরোপিয়ানরা একাধিক আন্তর্জাতিক রুটে ট্রেন চালানোর পরও সেখানে সময়মতো সব গাড়ি পৌছে যায়। অথচ আমাদের দেশে মূলত একটিই রুট, ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং সেটাই চালাতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি।

বাংলাদেশে মন্ত্রী আড়াইশ মাইল স্পিডের ট্রেন চালানোর কথাও সংবাদ সম্মেলন করে প্রচার করছেন। কিছু মানুষ সেটা বিশ্বাসও করছে!

কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ, বেহুদা কথাবার্তা না বলে অন্তত পক্ষে যা আছে তা দিয়েই লাইনগুলো সংস্কার করে যাত্রা সময়টা যেন কমিয়ে আনতে পারা যায় এবং স্টেশনের পাচ মাইল এলাকা যেন দস্যুমুক্ত হয় – এই দুটি কাজ করুন।

চট্টগ্রাম থেকে

জানা অজানা

- এম শিহাব উদ্দিন ভূঞা

পেশাগত কারণে আমাকে প্রায়ই দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে বেড়াতে হয়। ঢাকা থেকে সিলেট এবং ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এ দুই জায়গায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সাধারণত প্রাইভেট কারের পরিবর্তে ট্রেন ব্যবহার করি। কমলাপুর থেকে এ দুই জায়গায় যাতায়াতের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ তুলনামূলকভাবে একটু বেশি মনোযোগী বলেই আমার মনে হয়।

যাহোক বার বার যাতায়াতের কারণে ট্রেন ভ্রমন বিষয়ক আমার ঝুলি নানান অভিজ্ঞতায় ভরপুর।

ছোটবেলায় প্রথম ট্রেনে চড়ি এ রকম এক সময়ে যখন আমি না নাবালক, না সাবালক। মায়ের সঙ্গে ঘোড়াশাল স্টেশন থেকে কমলাপুর এসেছিলাম। মায়ের দৃষ্টিতে আমি অতি ছোট। তাই টিকেট কাটা হয়নি। কিন্তু চেকারের দৃষ্টিতে আমি যথেষ্ট বড়। এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হলো। বেশির ভাগ প্যাসেঞ্জার আমার পক্ষে ছিল বলে চেকার বেশি সুবিধা করতে পারলো না।

শেষে আটকিয়ে দিলেন স্টেশন ছাড়ার সময় গেটের জনৈক কর্মকর্তা। বদমেজাজি ওই ভদ্রলোকের সোজা হুমকি, এ বাচ্চা আটকিয়ে রাখা হবে।

এ কথা শুনে আমার মা হঠাৎ সশব্দে কান্না জুড়ে দিলেন। উপস্থিত সকলে হতবাক। এ অবস্থায় আর আটকায় কে?

এখনো এ ঘটনাটা আমার পারিবারিক আড্ডায় বেশ মজার সঙ্গে আলোচিত হয়।

জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি কলেজে মাস্টার্স পড়ছি। থাকি নারায়ণগঞ্জ। সহপাঠীদের মধ্যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে আমরা দশজন ছেলে আর দশজন মেয়ে। সব মিরিয়ে বিশজন একটি গ্রুপ করে একত্রে আসা-যাওয়া করি।

তখন ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জের যাতায়াত ব্যবস্থা অতো ভালো ছিল না। একেক দিন একেকভাবে ক্লাসে আসতাম। কখনো ফতুল্লা এসে লঞ্চে সদরঘাট, কখনো মুড়ির টিন জাতীয় বাসে নারায়ণগঞ্জ থেকে সোজা সদরঘাট আবার কখনো নারায়ণগঞ্জ থেকে গুলিস্তান হয়ে কলেজে।

হঠাৎ একজন জানালো, চাষাড়া থেকে ট্রেনে উঠে গেন্ডারিয়া নেমে রিকশায় *জগাবাবুর পাঠশালায়* যাওয়া যায়।

পূর্ব নির্ধারিত টাইমে সবাই একত্রিত হলাম চাষাড়াতে। ট্রেন এলো। উঠলাম।

ফতুল্লা পার হওয়ার পর এক জায়গায় যেতেই ঠাস ঠাস আওয়াজ। চিৎকার করে অনেকেই ফ্লোরে বসে পড়লো। দেখাদেখি আমরাও।

দুই মিনিট পরেই আবার সবাই উঠে দাড়ালো।

কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল প্রতিদিন এ জায়গা থেকে কিছু দুষ্টু ছেলেরা ট্রেন লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছুড়ে মারে এবং প্রায়ই যাত্রীরা আহত হয়।

অফিসের কাজে একবার কমলাপুর থেকে ট্রেনে চিটাগাং যাচ্ছি। গাড়িতে ওঠার সময় দি ইন্ডিপেনডেন্ট এবং অবজারভার পত্রিকা দুটি সঙ্গে নিয়েছি। অনেক সময় লাগবে। তাই আরেকটি পত্রিকা কিনবো কি না এ রকম ভাবছি। এমন সময় তাকিয়ে দেখি আমার বরাবর ডান পাশের সারিতে এক বয়স্ক ভদ্রলোক ডেইলি স্টার নিয়ে উঠেছেন। এয়ারকন্ডিশনড কম্পার্টমেন্টে সাধারণত মার্জিত শ্রেণীর লোকেরাই ভ্রমণ করে থাকে। ভাবলাম আর কেনার দরকার নেই, ওনার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়বো।

ঘণ্টা দুয়েক পরে খেয়াল করলাম, ভদ্রলোক ক্লান্ত ভঙ্গিতে গা এলিয়ে দিয়ে পত্রিকা ভাজ করে সামনের ছোট টেবিলটায় রেখে দিয়েছেন।

সিট থেকে উঠে গিয়ে বিনীতভাবে তার পত্রিকাটি ধার চাইলাম।

রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে তিনি আমার দিকে তাকালেন। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আমাকে না করে দিলেন।

খুব লজ্জা লাগলো। মুখে একটা কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললাম, ইচ্ছা হলে আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে অন্য দুটি দৈনিক পড়তে পারেন।

তিনি এবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। যা বললেন এবং যেভাবে বললেন তা পাঠকের কাছে বলে আরেকবার লজ্জা পেতে চাই না। মনে মনে ভাবলাম জন্মের পরে বোধহয় ওনার মুখে মধু দেয়া হয়নি।

নিজ সিটে ফেরত এসে সারাক্ষণ শুধু ভাবছি, ভদ্রলোকের স্ত্রী তার সঙ্গে ঘর-সংসার করছেন কিভাবে?

একবার ট্রেনে সিলেট থেকে ফিরছি। রাতের জার্নি। কোনো এক স্টপেজ থেকে টিভি অভিনেত্রী সুইটি আমাদের বগিতে এসে বসলেন। সঙ্গে অল্প বয়সী একটি মেয়ে, হাতে ঢাউস সাইজের একটি মেকআপ বক্স। এয়ারকন্ডিশনড রূপ। বেশ ঠাণ্ডা। বার বার টয়লেটে যেতে হচ্ছে। সুইটিরও ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু দৃষ্টিকটু লাগলো, প্রতিবারই সুইটির সঙ্গে সহযাত্রী মেয়েটি মেকআপ বক্স হাতে টয়লেটে আসা-যাওয়া করছে। আরো খারাপ লাগলো, কয়েকজন উৎসাহী যাত্রীর হ্যালো, হাই-এর জবাবে সুইটির গোমড়ামুখী নিরুত্তাপ ব্যবহার।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, সুইটি যখন নতুন মডেলিং শুরু করেছেন তখন একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছি। আমাদের একটি পণ্যের বিজ্ঞাপন চিত্র নির্মাণ করছিলেন প্রখ্যাত অ্যাডমেকার আফজালভাই। তিনি যখন সুইটির নাম আমাদের কাছে প্রপোজ করলেন, একবার শুনেই না বলে দিলাম।

কিন্তু আফজালভাই অনড়। বললেন, মেয়েটি একটি মাত্র অ্যাড করেছে, দেখবেন সে খুবই নাম করবে।

আফজালভাইয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় সুইটিকে নেয়া হয়েছিল। তখন তার আচার-আচরণে ইউনিটের সবাই মুগ্ধ হয়েছিল। সেই সুইটি সেলিবৃটি হওয়ার পর গোমড়ামুখী হয়ে গেল? ভাবতে খারাপ লাগছিল।

ট্রেনে চড়া অবস্থায় সাধারণত ঘুমুতে পারি না। সেটা রাতেই হোক আর দিনের বেলায়ই হোক। অনেকেই এ কাজটি অবলীলায় করে ফেলে।

একবার সিলেট থেকে ঢাকা আসছি। রাতের ট্রেন। যাত্রীদের বেশির ভাগই ঘুমিয়ে পড়েছে। একজন যাত্রী প্রচণ্ড শব্দে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে। ভদ্রলোকের আওয়াজে কেউ-ই শন্তিতে ঘুমুতে পারছে না। সঙ্গে তার স্ত্রী।

নাক ডাকার আওয়াজ যখন মোটরবাইকের আওয়াজকে হার মানার উপক্রম হয় তখনই স্ত্রী বেচারী স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিচ্ছেন।

মানুষের নাক ডাকার আওয়াজ এতো তীব্র হতে পারে, আমার জানা ছিল না।

আহম্মদবাগ, ঢাকা থেকে

উদ্ধার অভিযান

- কায়সার মামুন

তিন যুগ আগে ঘুমচোখে বরিশালের লঞ্চ থেকে নেমে চাদপুরে প্রথম ট্রেনে উঠে নানাবাড়ি যাওয়া। এরপর কাজ আর জীবিকার টানে পৃথিবীর বহু দেশ ট্রেনে চড়তে হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মনে পড়ছে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে একটি ঘটনা।

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর। সবে চট্টগ্রাম মেডিকাল কলেজে ভর্তি হয়েছি। নাসিরাবাদে মামার বাসায় থেকে লেখাপড়া করি। প্রায়ই ঢাকা আসি বেড়াতে। একবার আম্মা বললেন, আমার সঙ্গে চট্টগ্রাম বেড়াতে যাবেন। মহানগর ট্রেনে টিকেট কাটা হলো। আম্মা ও ছোট বোন ছাড়াও সঙ্গে রয়েছে সহপাঠী পারভেজ।

ট্রেন ভ্রমণ ভালোই হচ্ছে। সারাক্ষণ আড্ডা, সেই সঙ্গে খাওয়া–দাওয়া। রাত আটটার দিকে চট্টগ্রামের কাছে এক জায়গাতে হঠাৎ করে ট্রেন থামলো। মনে হচ্ছে কেউ চেইন টেনে ট্রেন থামিয়েছে। চারদিকে জঙ্গল আর পাহাড়। বাইশ বছর আগে দেশের আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেক ভালো থাকলেও যাত্রীর সবাই কিছুটা উদ্বিগ্ন।

আমি এবং পারভেজ সামনে এগোলাম ঘটনা জানার জন্য। কয়েকটা বগি পার হয়ে এসে দেখি একটা বগিতে বেশ ভিড়। কান্নাকাটির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলাম এক তরুণী এবং এক মধ্যবয়সী মহিলা কাদছেন। শুনলাম একটি ছোট মেয়ে, তরুণীর ছোট বোন ট্রেনের জানালা দিয়ে পড়ে গিয়েছে।

যতোদূর মনে পড়ে, মহানগর এক্সপ্রেসের জানালা বেশ নিচু। ফলে ছোট বাচ্চাদের পক্ষে পড়ে যাওয়া সম্ভব। বাচ্চাটি পড়ে যাওয়ার পর যখন সবার খেয়াল হলো তখন ট্রেনের চেইন টানা হয়েছে।

কিছু লোক বললেন, ট্রেন থেকে পড়লে বাচার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আমাদের চট্টগ্রাম চলে যাওয়া উচিত। বাকি ব্যবস্থা ওখান থেকে করা যাবে। বেশির ভাগ লোক মেয়েটিকে না নিয়ে এগোতে রাজি হলেন না। কথা হলো, কে যাবে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে? জঙ্গলঘেরা পাহাড়ি জায়গা বলে সবাই কিছুটা ভয় পাচ্ছেন। তার ওপর বেশ রাত। কেউ ট্রেন থেকে নামতে রাজি না।

অবশেষে এক সৈনিকভাই এগিয়ে এলেন, বললেন, আমার সঙ্গে আরেকজন লোক গেলে আমি যাবো।

সবাই চুপ।

খারাপ লাগলো এটা ভেবে যে, একজন লোক সাহায্য করতে রাজি, অথচ আমরা কেউ তার সঙ্গে যেতে চাইছি না। কিছুটা ভেবে রাজি হয়ে গেলাম। বন্ধু পারভেজও উৎসাহ যোগালো।

দুজন মিলে ট্রেন থেকে নামলাম। চাদের আলোয় রেললাইন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লাইনের ওপর দিয়ে হাটা শুরু করলাম। প্রায় দুই মাইল হাটার পর দূর থেকে কান্নার আওয়াজ পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি সাত আট বছরের মেয়ে রেললাইনের পাশে বসে মৃদু স্বরে কাদছে।

ফার্স্ট ইয়ার মেডিকাল ছাত্রের সীমিত অভিজ্ঞতায় বুঝলাম মেজর কিছু হয়নি। আল্লাহর রহমতে মেয়েটি ট্রেন থেকে পড়ে লাইনের বাইরে গিয়ে পড়েছিল। তাই কোনো সমস্যা হয়নি। তবে হাত পা থেকে বেশ রক্ত পড়ছে।

সৈনিকভাই মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলেন।

কিছুদূর গিয়ে আমি কোলে নিলাম।

এভাবে পালা করে দুজনে মিলে কিছুদূর এসে ট্রেনে পৌছে গেলাম।

আমরা উদ্ধার কাজে রওনা হওয়ার পর ট্রেন ড্রাইভার ট্রেনটি উল্টোদিকে চালিয়ে আমাদের ফেরার পথ কমিয়ে দিয়েছিলেন।

ট্রেনে ফিরে মেয়েটিকে তার মা–বোনের কোলে ফিরিয়ে দিলাম।

নিজের বগিতে ফিরে হাত পা থেকে রক্ত মুছে নিলাম।

ট্রেন এবার দ্রুত গতিতে চট্টগ্রাম রওনা হলো।

দেরি হয়ে যাওয়ার ক্ষতি পুষিয়ে ট্রেন ড্রাইভার যথাসময়ে আমাদের চট্টগ্রাম পৌছে দিলেন।

সিংগাপুর থেকে

Consultant, MCR No. 09557E
Singapore General Hospital
www.sgh.com.sg

দেশে বিদেশে

- জামাল উদ্দিন আহমেদ

মায়ের কাছে শুনেছি আমার প্রথম ট্রেন যাত্রা তার কোলে চড়ে জন্মস্থান মুন্সিগঞ্জ থেকে বাবার কর্মস্থল ফরিদপুর যাওয়া। স্টিমারে গোয়ালন্দ পৌছে কয়লার ইঞ্জিনের ট্রেনে ফরিদপুর। ওখানেই কৈশোরে পা দেয়া এবং এই রুটে অনেকবার যাতায়াত। রাতে গোয়ালন্দ পৌছার আগে থেকেই ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা ঘাটের মায়াবী আলোকমালা, কুলিদের দৌড়-ঝাপ, ঘাটে বাধা প্যাডল স্টিমার *অস্ট্রিচ* বা *মাসুদ*-এর স্মৃতি সবই এখনো উজ্জ্বল।

ষাটের দশকের শেষ দিকে বাবা তার নতুন কর্মস্থল জামালপুরে। পূর্ব পাকিস্তানে তখন ডিজেল লোকোমোটিভ চালু হয়েছে। পৃমিয়াম ট্রেন *দ্রুতযান*-এ ঢাকা থেকে জামালপুর যাওয়ার মজাই আলাদা। দ্রুতগতির এই ট্রেনে বুফে কারের সিট দখল নিয়ে ছিল প্রতিযোগিতা। তাছাড়া ছাত্র কনসেশনের সুবাদে ছুটির শুরুতে প্রথম শ্রেণীর বগি রিজার্ভ করে প্রকৌশল ইউনিভার্সিটি ও ঢাকায় অধ্যয়নরত বন্ধুরা মিলে জামালপুর যাওয়ার স্মৃতি আজো ভোলার নয়। রাজেন্দ্রপুর, সাতখামাইর ছুয়ে ট্রেন চুটছে আর আমরা ফিল্ম সোসাইটিতে সদ্য দেখা ওয়াইদার *অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ড* অথবা সত্যজিতের *চারুলতা*-র তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ব্যস্ত। মাঝে সিরাজ শিকদারও আসছেন আলোচনায় তার শ্রেণী সংগ্রামের লাইন নিয়ে। হয়তো একটি জাংশনে কয়েকটি বগি নিয়ে দাড়িয়ে আছে *দি ওল্ড ফেইথফুল* কয়লার ইঞ্জিন। নষ্টালজিয়ায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায় মন।

সুইস লেখক পিটার বিকসেল ট্রেনযাত্রাকে আখ্যায়িত করেছেন *শূন্যময় মহাকাল* হিসেবে।

কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। আলাপচারিতা, ফেরিওয়ালার হাক-ডাক, ভিক্ষুকের গান আর রাজনীতির উচ্চকণ্ঠে শূন্যতার ত্রাহি অবস্থা। দ্রুততার বিচারে না হলেও ইনডিয়ান রেলওয়ে সিসটেম এশিয়ায় সবচেয়ে অগ্রসর। দীর্ঘ ট্রেনযাত্রায় বৈচিত্রময় এ দেশের দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যায়। মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে মোগলসরাই জাংশন অথবা ভোরের আলোয় এলাহাবাদের ত্রিবেনী সংগমের সিলুয়েট এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। কিংবা পাঞ্জাব, হরিয়ানার শস্য ক্ষেত এবং ইউক্যালিপটাস সারির ফাকে জাঠ রমণীর ট্রাক্টর চালনা দেখতে দেখতে লুধিয়ানা পৌছে যাওয়া। ইনডিয়ার রেল ভ্রমনের আরেকটি বড় প্রাপ্তি হলো বৈচিত্রময় মানুষ ও তাদের জীবনের চালচিত্র।

জম্মুগামী *হিমাগিরি এক্সপ্রেস*-এ পশ্চিম বাংলার এক ম্যাজিস্ট্রেট শুনিয়েছেন পঞ্চাশের দশকে তাদের মাইগ্রেশন পরবর্তী কঠিন জীবন সংগ্রামের কাহিনী। মাতৃভূমির প্রতি তার অকৃত্রিম টান এখনো অটুট। আরেক যাত্রায় দিল্লি থেকে সহযাত্রী ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ নাসিম। রাজনীতি, সত্তরের আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধ এবং বাংলাদেশে সামরিক শাসনের ধারা ইত্যাদি আলোচনায় দ্রুত কেটে গিয়েছিল দীর্ঘ সেই যাত্রা।

প্রথম হাই স্পিড ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা হয় জাপানে। আশির দশকের গোড়ায় *শিনকানসেন* তখন বিশ্বের দ্রুততম ট্রেন। জাপানিজদের জাতীয় গর্বের প্রতীক। ঘড়ির কাটা ধরে ছাড়া এবং পৌছানো, বগি নাম্বার ও সিটের সারি মিলিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাড়ানো, চোখ জুড়ানো অভ্যন্তরীণ সজ্জা, তারকা মানের টয়লেট ও দ্রুত গতি মিলিয়ে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। টোকিও থেকে ওসাকা পর্যন্ত সেই যাত্রায় জাপানিজ সহযাত্রীদের আন্তরিকতা এখনো ভুলিনি। জাপান এয়ারলাইন্সের বিমান ছিনতাই-এর সুবাদে *বাংলাদেশ* জাপানিজদের অনেকে এই উচ্চারণ করেন। তখন সারা জাপানে একটি প্রিয় নাম।

আমেরিকানদের সব কিছুই গ্র্যান্ড স্কেলের। তাদের রেল সংস্থা অ্যামট্রাক (Amtrak)-ও এর ব্যতিক্রম নয়। জালের মতো হাইওয়ে ও বিমান নেটওয়ার্কের কল্যাণে অ্যামট্রাক-এর ক্ষয়িষ্ণু দশা। তবে ভর্তুকি দিয়ে

আমেরিকানরা তাদের এই ন্যাশনাল হেরিটেজ টিকিয়ে রেখেছে। এমনকি বেশির ভাগ স্টেশনগুলো মনে হয় যেন ইতিহাসের বই থেকে তুলে এনে বসিয়ে দেয়া।

১৯৯৪ সালে প্রথম আমেরিকা যাই। ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল দেখার অবসরে একদিন ট্রেনে নিউ ইয়র্ক থেকে ফিলাডেলফিয়া হয়ে ওয়াশিংটন ডিসি যাই বেড়াতে। ফেরার পথে এক তরুণ সহযাত্রী স্বভাবসুলভ আমেরিকান নিয়মে আলাপ জমিয়ে ফেলে।

তখন সারা আমেরিকা জুড়ে *হেলথ বিল* নিয়ে তুমুল আলোচনা চলছে। তরুণটি সে সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলো।

বিনীতভাবে বলি যে, সেহেতু আমি আমেরিকান নই সেহেতু এ বিষয়ে আমার মতামত দেয়া সমীচীন নয়।

আমার উত্তরে তরুণটি বিস্মিত হয়ে বলে যে, এ ব্যাপারে মতামত দেয়ার জন্য আমেরিকান হওয়াটা জরুরি নয় এবং আমি নিশ্চয়ই একদিন আমেরিকান হয়ে যাবো।

সাধারণ আমেরিকানদের এই খোলা মনোভাব আরো অনেক লক্ষ্য করেছি। আজকের আমেরিকা হয়তো অনেক বদলে গেছে। তবুও জাতি হিসেবে আমেরিকানদের যতোটুকু সফলতা তা তাদের এই খোলা মানসিকতার জন্যই হয়েছে।

যাহোক, অ্যামট্রাক–এ আমার আরো দুটো স্মরণীয় ভ্রমণ হচ্ছে লস এঞ্জেলেস থেকে দক্ষিণের মেক্সিকো সীমান্ত শহর সান ডিয়েগো ও উত্তরের অবকাশ কেন্দ্র সান্তা বারবারা।

ডেট্রয়েট–এ অধ্যয়নরত ছোট বোন রেখা হয়েছিল সে যাত্রার সঙ্গী। এ রুটের অনেকটাই প্রশান্ত মহাসাগরের কিনারা ঘেষে। রেললাইন থেকে কয়েক গজ দূরেই সাগরের বেলাভূমি। অন্যদিকে সারি সারি পাম গাছ। প্রকৃতির এই অনাবিল সৌন্দর্য আমরা মুগ্ধ নীরবতায় উপভোগ করেছি।

কানাডার VIA Rail–এ ভ্রমণও সুখস্মৃতি হয়ে আছে। আমার স্ত্রী শিরিন ও মেয়েকে নিয়ে ২০০১ সালে টরন্টো থেকে আমেরিকার ডেট্রয়েট যাই উইন্ডসর হয়ে। ডেট্রয়েট–এর উল্টোদিকে উইন্ডসর কানাডার সীমান্ত শহর। ছবির মতো সব জনপদ পেরিয়ে উইন্ডসরে যাত্রা বিরতি। অতঃপর ক্যাবে ডেট্রয়েট নদীর টানেল দিয়ে ডেট্রয়েট–এ পা দেয়া। শিরিন আজো সেই স্মৃতি ভোলেনি। কেননা সেই ছিল তার প্রথম আমেরিকার মাটিতে পা রাখা। আর কোচের অ্যাটেনডেন্ট মহিলার দেয়া একগাদা রঙিন পেনসিল, ছবির বই, পাজল আর খেলনা আমার মেয়ে এখনো সযত্নে রেখে দিয়েছে।

বলা হয় ইওরোপিয়ান রেল আজকের বিশ্বের সবচেয়ে দক্ষ রেল সিসটেম। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ও পর্যটক হিসেবে সমগ্র পশ্চিম এবং দক্ষিণ ইওরোপে অসংখ্যবার ট্রেন ভ্রমণ করতে হয়েছে এবং প্রতিটি যাত্রাই এক একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণ কাহিনী হতে পারে। গতি, সময়ানুবর্তিতা, ভাষা ও জাতিগত বৈচিত্র, যাত্রাপথের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নিখুত সেবা ইত্যাদি মিলিয়ে ট্রেন ইওরোপের যাতায়াতের প্রধান আকর্ষণীয় বাহন।

শেংগেন চুক্তির ফলে ইইউ–ভুক্ত বেশির ভাগ দেশ এখন সীমানা বিহীন রেল চলাচলের আওতায়। প্রতিদিন ইওরোপের বিভিন্ন প্রান্তে হাজার হাজার ট্রেন চলাচল করছে। বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী ও প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রসর ট্রেনগুলো এখন ইওরোপিয়ান রেল সিসটেমের আওতায়। এর ভেতর ফ্রান্সের TGV, জার্মানির ICE, কনসোর্টিয়ামের Thalys, স্পেনের AVE ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইওরোপে রেল ভ্রমণের সবচেয়ে চমৎকার পন্থা হলো ইওরেইল পাস কেনা। প্রায় অর্ধেক ভাড়ায় ফার্স্ট ক্লাসে সারা ইওরোপ ভ্রমণে এর জুড়ি নেই।

ইওরোপে আমার স্মরণীয় রেলযাত্রার একটি হলো প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর সঙ্গে প্যারিস থেকে অ্যামস্টার্ডাম যাওয়া এবং ভ্যানগঘ মিউজিয়াম দেখা। এই যাত্রায় বন্ধুবর মিন্টুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এর আগে প্যারিসে আমরা কয়দিন *লুভ, মুজি দি পিকাসো, পপিদু সেন্টার, নতরদাম* দেখে বেড়িয়েছি। শিল্পকলার এসব তীর্থে তার সঙ্গ পাওয়াটা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।

আমরা খুব ভোরে গার-দু-নর্ড থেকে *থ্যালিস*-এ চড়ে বসি। ভোরের আলোয় ফ্রান্সের বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেতে হলুদ, সবুজ আর বাদামির অপূর্ব রঙিন ক্যানভাস আমাদের মোহাবিষ্ট করে ফেলে। ট্রেন ফ্রান্স পার হয়ে ক্রমন্বয়ে ব্রাসেলস, রটারডাম-এর দিকে এগোতে থাকে আর আমরা ক্রমেই ডুবে যেতে থাকি সালভাডর ডালি-র সুররিয়ালিজম, মাতিস, শেজান থেকে পিকাসো হয়ে হালের মকবুল ফিদা হুসেন-এ।

অসাধারণ এক প্রতিভা এই কাইয়ুম চৌধুরী। শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতের সব শাখায় তার অবাধ বিচরণ। বলছিলেন দিগন্ত ছোয়া এ শস্যক্ষেত তাকে *ব্যালাড অফ এ সোলজার*-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ট্রেন যখন অ্যান্টওয়ার্প পৌছায় তখন জানা গেল, কোনো কারণে আমরা বত্রিশ মিনিট পিছিয়ে আছি।

কোচ অ্যাটেনডেন্ট আমাদের দিয়ে একটি ফর্ম ফিল আপ করিয়ে নিয়ে ঘোষণা দিলেন এই দেরির জন্যে সবাইকে অর্ধেক ভাড়া ফেরত দেয়া হবে।

যথানিয়মে তিন সপ্তাহ পরে সে টাকা ক্রেডিট কার্ড একাউন্টে জমা হয়।

মিউজিয়াম দর্শন শেষে ফিরতি ট্রেনে ওঠার আগে আমরা অ্যামস্টার্ডাম স্টেশনের সঙ্গেই নদীর পারে বসে একটি চমৎকার সন্ধ্যা উপভোগ করি।

২০০৩-এর গ্রীষ্মে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ইওরোপ যাই। ফ্র্যাংকফুর্ট এয়ারপোর্ট সংলগ্ন রেলস্টেশন থেকে ডয়েশ রেলের দ্রুততম ট্রেন ICE-তে চেপে চলে যাই মিউনিখ। গতিতে প্রায় ফ্রান্সের (TGV)-এর কাছাকাছি। কম্পার্টমেন্টে সব নীল চোখের গোমড়ামুখো জার্মান। কিন্তু আমার সদা চঞ্চল মেয়ে কিছুক্ষণের ভেতর বগির পরিবেশ বদলে ফেললো। এবং মিউনিখে যাত্রাবিরতির আগে ক্যান্ডি, বই, স্টিকার, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি মিলিয়ে একটি অতিরিক্ত ব্যাগ তৈরি হয়ে গেল তার। মিউনিখে প্রথম দিন থেকে আমরা *ভেনোজিয়া এক্সপ্রেস*-এ অস্ট্রিয়ার ইনসব্রুক, ইটালির ভেরোনা, বলজানো, পাদুয়া হয়ে ভেনিস পৌছাই।

এই রুটটি পৃথিবীর অন্যতম সিনিক (Scenic) রেল রুট হিসেবে পরিচিত। প্রায় অর্ধেকটাই আলপস-এর ভেতর দিয়ে বিস্তৃত। তখনো বিভিন্ন চূড়ায় বরফ জমে আছে। আর সবই ঘন সবুজ। অসংখ্য টানেল, সেতু ও শাদাসবুজে মোড়ানো এই রেলপথে ভ্রমণ এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা। আমার ছোট্ট মেয়েটি পর্যন্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে তার স্বভাবসুলভ চঞ্চলতা ভুলে অপার বিস্ময়ে উপভোগ করেছে এই যাত্রা।

ভেনিস থেকে ভিয়েনা যাওয়ার পথে মেয়ে জ্বরে আক্রান্ত হয়। কোচ অ্যাটেনডেন্ট সেটা লক্ষ্য করে আমাদের বগি সম্পূর্ণ রিজার্ভ করে দেয়। সেই সঙ্গে রাতের যাত্রায় অতিরিক্ত বালিশ, কম্বল ও ফল, কেক, দুধ এনে হাজির করে এবং প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর এসে খোজ নিয়ে যান।

কর্তব্য বোধ ও মানবিকতার এ অনন্য দৃষ্টান্ত আমরা আজো স্মরণ করি। সে যাত্রায় ভিয়েনা থেকে *সাউন্ড অফ মিউজিক*-খ্যাত সলজবুর্গ হয়ে জার্মানি অতিক্রম করে প্যারিস ফিরে আসি।

সুইটজারল্যান্ডকে বলা হয় রেল পর্যটকের অবশ্য গন্তব্য। পুরোটা দেশই একটি ভিউ কার্ড। পাহাড়, নদী অরণ্য আর ফুল মিলে সত্যিকারের ভূস্বর্গ। সুইসরেল তার ডিজাইন, রঙ বিন্যাস আর নান্দনিকতার জন্য বিশ্ব শ্রেষ্ঠ। লুজার্ন থেকে এংগলবার্গ এই ছোট্ট ট্রেনযাত্রার কথা ভাষায় বোঝানোর নয়। একদিকে লেক, অন্যদিকে সুউচ্চ আলপসের চূড়ায় বরফ, উপত্যকায় ঘন সবুজ ঘাস ও বুনো ফুলের কার্পেট, পাহাড়ি ঝরনা থেকে বয়ে আসা নদী, গলায় ঘণ্টা বাধা শাদা-কালো ছোপের গরু, মনে হয় ঈশ্বর সত্যিই বড় একপেশে!

এংগলবার্গ নেমে আমরা কেবল কার-এ উঠে যাই দশ হাজার ফুট উচ্চতায় মাউন্ট টিটলিসে গ্লেসিয়ারের রাজ্যে। সেই ধবল তুষারে আমার মেয়েটি মেতে উঠে স্লেজিংয়ে। সুইটজারল্যান্ড-এর আরেক বিস্ময় ইউংফ্রাইতে *কগ হুইসল* ট্রেন। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ও টানেলের ভেতর দিয়ে ট্রেন আপনাকে নামিয়ে দেবে চিরতুষারের রাজ্যে।

বিশ্বের দ্রুততম ট্রেন TGV-তে চড়ে প্যারিস থেকে ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার শহর নিস হয়ে মোনাকো যাওয়ার অভিজ্ঞতাও ভোলার নয়। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি আমি ও আমার কাজিন স্পেন যাই। তখন বিটিভি-তে

স্পেনে মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস ভিত্তিক সিরিয়াল *রিকুয়েম ফর গ্রানাডা* চলছে। আমরা জেনিভা থেকে দক্ষিণ ফ্রান্সের মপেলিয়েতে ট্রেন বদল করে স্প্যানিশ রেল RENFE-তে করে বার্সেলোনা পৌছাই।

ভূমধ্যসাগরের পাড় দিয়ে সুন্দর সেই রেলযাত্রা। পাহাড়ের গা ঘেষে চলা সেই ট্রেনের অনেক নিচে সাগরে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। পরে আমরা যাই মাদৃদ থেকে কর্ডোভা হয়ে গ্রানাডায়। পথে ববডিলা নামে ছোট্ট একটা স্টেশনে ট্রেন বদলাতে হয়েছিল। স্টেশন কেন্দ্রিক পঞ্চাশ ষাটটি বাড়ির একটি ছোট্ট গ্রাম। কমলা গাছে ঘেরা একটি বাজার। আমাদের ঘিরে সবার সে কি উৎসাহ। ববডিলা থেকে গ্রানাডা রেলপথের দুই ধারে যতো দূর দৃষ্টি যায়, শুধু অলিভ আর সানফ্লাওয়ার খামার। হলুদ সবুজের পাহাড়। হঠাৎ দুই চারটা বাড়ি এবং দুই একজন মানুষ দৃষ্টি বিভ্রম ঘটায়।

রাতে গ্রানাডায় জিপসিদের ডেরায় ফ্ল্যামেংকো নাচের স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল। গ্রানাডা থেকে ফিরে দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় মাদৃদ থেকে বাস্ক অঞ্চলের বিলবাও ও ফ্রান্সের *ওয়াইন ভ্যালি* বর্দো হয়ে প্যারিস ফিরে আসি।

ইংল্যান্ডে ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও অনেক। একটি ওয়ার্কশপ উপলক্ষে ইংলিশ মিডল্যান্ড-এর ছোট্ট ছবির মতো শহর চিপিং ক্যাম্পডেন-এ এক মাস অবস্থান করতে হয়। উল্লেখ্য, চিপিং ক্যাম্পডেন বিখ্যাত পর্যটন এলাকা। প্রতি উইকএন্ডে মেঠোপথ দিয়ে মোরেটন-ইন-মার্শ স্টেশনে আসতাম। লন্ডনে দুদিন কাটিয়ে রবিবার বিকেলে প্যাডিংটন থেকে আবার ফিরতি যাত্রা। সন্ধ্যায় মোরেটন-এ হয়তো আমি একাই যাত্রী। মাতৃসমা নোয়েল নোবাস গাড়ি নিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে একাকী অপেক্ষা করছেন। বাকি জীবনে তার সেই মমত্ব মন থেকে মুছবে না।

সবশেষে একটি ভিন্ন মাত্রার রেলযাত্রার কথা যা জড়িয়ে আছে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ও একটি জাতির জন্মগাথার সঙ্গে। ১৯৭১-এর নভেম্বরে দেরাদুন থেকে সামরিক ট্রেনিং শেষে ফিরছি। লক্ষ্ণৌ থেকে ট্রেন বদল। বিহারের কাটিহার হয়ে গন্তব্য আসামের বংগাইগাও। তারপর তুরা অপারেশন ক্যাম্প।

আগেই শুনেছিলাম ভোরে ট্রেন জলপাইগুড়ি অতিক্রম করবে। আমরা সবাই জেগে থাকলাম কাঞ্চনজংঘা দেখার আশায়। চা বাগানের ভেতর দিয়ে ট্রেন ছুটছে বাংলাদেশ সীমান্তের খুব কাছ দিয়ে। একটু একটু আলো ফুটছে আর বাম দিকের আকাশে বিশাল এক গলিত সোনার আভাস।

ডানে বাংলাদশের পুণ্যভূমিতে প্রথম আলো।

নতুন সূর্য উঠছে।

আমরা আসছি, মা!

গুলশান, ঢাকা থেকে

ব্যাগ

- মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ভূইয়া

গত বছর ৬ নভেম্বর ছিল রমজান মাস। আমি ও আমার ভাগ্নি রিপা নোয়াখালী থেকে ঢাকায় যাবো।

রিপা কখনো ট্রেন ভ্রমণ করেনি। তাই তাকে নিয়ে সোনাইমুড়িতে *আন্তঃনগর উপকূল এক্সপ্রেস*-এর অপেক্ষায় আছি।

নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে ট্রেন এলো।

আমরা উঠে গিয়ে আমাদের সিটে বসলাম। ট্রেনে যাত্রী ছিল খুবই কম। আর আমাদের বগি ছিল প্রায় যাত্রী শূন্য।

ট্রেন ছেড়ে দিল। আমাদের সামনের সিট ছিল খালি। ডান পাশের সিটে একটি ছেলে এসে বসলো। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম ছেলেটি একটি ছবি হাতে নিয়ে কাদছে।

ট্রেন লাকসাম এসে পৌছালো। লাকসাম এলে উপকূল ট্রেনের ইঞ্জিন পরিবর্তন করা হয়। সেখানে কিছু সময় দেরি হলো।

এদিকে ইফতারের সময় হয়ে গেল। বাইরে গিয়ে কিছু ইফতারি কিনলাম। ভাবলাম ছেলেটিসহ এক সঙ্গে ইফতার করবো।

কিন্তু উঠে দেখলাম ছেলেটি জানালামুখী হয়ে ইফতার নিয়ে বসে আছে। ওকে আর ডাকলাম না।

যথাসময়ে ইফতার করা শেষ হলো। ট্রেন ছাড়লো। ছেলেটি আবার ছবি হাতে নিয়ে কাদতে লাগলো।

রিপা বললো, মামা, ওকে ডাকেন, কথা বলি তার কি হলো?

বললাম, ও স্বাভাবিক হোক, তারপর না হয় ডাকবো।

বেশ কিছুক্ষণ পর ছেলেটিকে ডাকলাম।

ও আমাদের সামনের সিটে বসলো।

প্রথমে পরিচয় জানতে চাইলাম। গ্রাম এবং বাড়ির নাম বলার পর জিজ্ঞাসা করলাম লাভলী, ভাবলী তোমার কি হয়?

উত্তরে বললো, দুজনই আমার বড় বোন।

তার বোনদের সম্পর্কে জেনে নিলাম কে কোথায়, কেমন আছে। সে একটিবারও জানতে চায়নি আমি তার বোনদের কিভাবে চিনি। সে গত বছর এইচএসসি পাস করেছে।

জানতে চাইলাম তার কান্নার কারণ কি?

আপনাকে যে কিভাবে বলি!

তুমি নির্দ্বিধায় বলতে পারো।

জানলাম সে তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের তার এক খালাতো বোনকে ভালোবাসে। একই মেয়েকে ভালোবাসে ওই গ্রামের অন্য আরেকটি ছেলে। একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ বাধে দুই প্রেমিকের মধ্যে যা পরবর্তীকালে চরম আকার ধারণ করে।

ফলে গ্রাম্য সালিশ বসে দুই প্রেমিককে মেয়ের কাছ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়। প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কষ্ট সইতে না পেরে সেদিন সে যাত্রাপথে কেদেছিল।

তাকে অনেক বোঝালাম, আবেগ প্রবণ হয়ে কিছু করো না। তোমাদের এখন জীবন গড়ার সময়। প্রেম, ভালোবাসা নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না। কারণ বাস্তব বড়ই কঠিন।

সে উঠে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এসে বললো, অন্য এক বগিতে তার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ওই আত্মীয় তাকে সেখানে যেতে বলেছেন। তাই আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিল এবং বললো, এয়ারপোর্ট আসার আগে আরেকবার দেখা করবে।

আমরা মামা-ভাগ্নী হলেও সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। তাই তার বোনদের কথা রিপাকে বললাম।

লাভলী ও কুতুব দুজন ছিল ক্লাসমেট। দুজন দুজনকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। আর আমার সমবয়সী চাচা সায়েফ ভালোবাসতো ভাবলীকে। অবশ্য এদের দুই জুটির সম্পর্ক তিন বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। কুতুব বর্তমানে আমাদের ইউনিয়নের একজন সফল চেয়ারম্যান। অন্যদিকে সায়েফ একটি হাই স্কুলের বিসি শিক্ষক। অনেকক্ষণ তাদের গল্পই হলো। পরে আমাদের ব্যক্তিগত কিছু কাহিনী রিপাকে শোনালাম।

আমি যতোবার ট্রেনযোগে ঢাকায় এসেছি, প্রতিবার টংগি স্টেশন আসার আগেই নিজের ব্যাগ, মালপত্র হাতের কাছে নিয়ে রাখতাম। কারণ এয়ারপোর্ট স্টেশনে যাত্রী নামার সময় মালপত্র, এদিক-ওদিক হতে পারে। সেদিন যাত্রী কম থাকার কারণে উপর থেকে ব্যাগ নামাইনি। মহাখালী ফ্লাইওভারের কাজ চলার কারণে বনানী থেকেই ট্রেন ধীর গতিতে চলতে থাকে।

তেজগাঁও স্টেশন পার হওয়ার পর উপরে তাকিয়ে দেখি রিপার ব্যাগ নেই। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। সে কিছু বলতে পারেনি।

আমাদের সামনে তিন সিট আগে বি-বাড়িয়া থেকে দুটি ছেলে উঠেছিল। তারা বললো, মাত্র এক মিনিট আগে একটি লোক ব্যাগ নামিয়ে নিয়ে গেল। সম্ভবত সে এখনো নামতে পারেনি।

তাই তারাসহ পেছনের বগির দিকে হাটতে লাগলাম। যাত্রী না থাকার কারণে বগিগুলো ছিল অন্ধকার। মোবাইল চার্জ দিয়ে সিটের নিচ থেকে শুরু করে বাথরুম পর্যন্ত কোথাও দেখতে বাকি রাখিনি। ট্রেনের একেবারে শেষ প্রান্তে একটি লোক ঝিমাচ্ছে। ঢাকা শহরের কথিত হিরনচি।

সঙ্গের একটি ছেলে তাকে ধরে বললো, ব্যাগ কোথায় রেখেছিস?

সে কোনো উত্তর দিল না। তাই তাকে উত্তম-মধ্যম শুরু করলো।

নিষেধ করলাম এবং তাকে ধরে নিয়ে এলাম আমাদের বগিতে।

ট্রেন কমলাপুর এসে পৌছালো কিছু সময় আগে। এদিকে রেলওয়ে পুলিশ এসে হাজির হলো।

তাদেরকে ঘটনা বিস্তারিত জানালাম।

পুলিশ হিরনচিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো।

সে কোনো উত্তর না দিয়ে একটি অভিনব কৌশল অবলম্বন করলো। তার কোমর থেকে একটি বাশি বের করে বাশি বাজাতে লাগলো।

তখন পুলিশ আমাদেরকে বললো, লোকটি বোবা, কথা বলতে পারে না। আপনি ইচ্ছা করলে মামলা দায়ের করতে পারেন। তবে কোনো কাজ হবে বলে মনে হয় না।

প্রায় দশ হাজার টাকার জিনিসপত্র থাকাতে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সাক্ষী হিসেবে থাকতে হবে ওই দুটি ছেলেকে।

তারা প্রথমে রাজি হলো। কিন্তু একটি ছেলের মা হাসপাতালে থাকার কারণে পরে সে সাক্ষী হতে রাজি হলো না। কারণ তার মায়ের দেখাশোনা করতে হবে।

সবাই আমাকে বোঝালো, যা হাবার হয়ে গেছে, মনে করুন এটি একটি দুর্ঘটনা।

অনেকটা হতাশ হয়ে শূন্য হাতে বাসায় ফিরে গেলাম।

সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী থেকে

কোদামাতে তুমি

- মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

কোদামা?

আমি নিশ্চিত, নামটি শুনে অনেকেই বেশ অবাক হয়েছেন।

আমিও হয়েছিলাম প্রথমবার।

আমি যখন ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলে ক্লাস থৃতে ভর্তি হলাম তখন এই নামের কাছাকাছি কদম ফুলের সুবাসে বিমোহিত হয়েছিলাম। আজও সেই কদম গাছটি সগৌরবে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে। আমি অবশ্য বিখ্যাত কেউ না। যদি বিখ্যাত হতাম তাহলে বাংলাদেশের বাবা-মায়েদের বলতাম, আপনাদের সন্তানের এই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন, পাবেন সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। এরপর পেয়েছিলাম সুবাস ঢাকা কলেজে ভর্তির সুবাদে।

তারপর! সে এলো আমার জীবনে প্রেমের সৌরভ নিয়ে। সেই সৌরভে আবিষ্ট থাকলাম পুরো দশটি বছর। আজ মনে হয়, সেই পুরো দশটি বছর ছিল যেন একটি বসন্তকাল।

তাকে ছাড়াই জাপানে প্রবাসী হলাম উচ্চ শিক্ষার তাগিদে। শুরু হলো বিরহকাল। এই কালের স্থায়িত্ব ছিল পুরো তিনটি বছর।

পহেলা অক্টোবর ২০০৪। সে সূর্যোদয়ের দেশটিতে পদার্পণ করবে। আমি আগের দিন রাতে ট্রেনে রওনা হলাম, সেও ওই সময়ে ঢাকা থেকে আকাশে উড়াল দিল।

তাকে পেলাম একটু দেরিতে। কারণ বিমান বাংলাদেশের ফ্লাইট ছিল ডিলেইড। তাকে দেখার আগে সময় যাচ্ছিল শম্বুক গতিতে আর এখন যাচ্ছে বুলেট গতিতে।

যাই হোক। তাকে পাওয়া মাত্র আমার সকল অবসাদ কেটে গেল নিমেষেই। ইচ্ছা করছিল তাকে জড়িয়ে ধরে থাকি অনেকক্ষণ কিন্তু সঙ্গে ওর খালা ও ছোট খালাতো ভাই থাকার কারণে সেটা করা হয়ে ওঠেনি।

চারদিন ওনাদের সঙ্গে টোকিওতে বেশ মজার সময় কাটিয়ে আমরা দুজনে আমার ইউনিভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ইউনিভার্সিটিটা টোকিও থেকে অনেক দূরে এবং পুরো ভ্রমণটি ট্রেনে করলেও চার ঘণ্টা সময় লাগে।

আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, ওকে প্রথমেই বুলেট ট্রেনে চড়াবো। তাই এখন সুযোগ হাতছাড়া করলাম না।

টোকিও স্টেশনে এসে অনেকগুলো ইয়েন খরচ করে যখন বুলেট ট্রেনের টিকেট কাটছিলাম তখন ও আমাকে বললো, চলো আমরা লোকাল ট্রেনে গল্প করতে করতে চলে যাই। গল্পও হবে, ইয়েনও বাচবে।

আমরা দুজনে কিপটামি একেবারেই পছন্দ করি না। কিন্তু মিতব্যয়ী হতে চেষ্টা করি। তাই ওর পরামর্শ শুনে অবাক হলাম না।

শুধু বললাম, প্রিয়তমা, তোমাকে *কোদামাতে* চড়াবো এ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন, আমাকে নিরাশ করো না, প্লিজ!

তার ডাগর কালো নয়ন দুটি আস্তে আস্তে প্রশ্নবোধক হয়ে পড়লো।

কোদামা! এটা কি? খায়, না মাথায় দেয়?

বুঝলাম ভুলটা হয়েছে আমারই। কিন্তু ততোক্ষণে হাসতে হাসতে আমার পেট ব্যথা হয়ে গেছে।

প্রিয়তমা, বুলেট ট্রেনের তিনটি শ্রেণী আছে *নোজুমি, হিকারি* এবং *কোদামা*। আমরা যে শহরে থাকি সেখানে শুধু কোদামা এবং হিকারি যাত্রাবিরতি করে। তাই আমরা কোদামাতে যাবো।

সেদিন আমাদের কোদামা যাত্রাটা ছিল গল্পে ভরা সুন্দর পুনর্মিলনের।

জাপান থেকে
rm_masudur@yahoo.com

হাওড়া টু জয়পুর

সুফিয়া বেগম

৫ জানুয়ারি ২০০৩ সাল। রাত এগারোটায় হাওড়া–যোধপুর এক্সপ্রেসে চড়ে বসেছি। গন্তব্য জয়পুর। উদ্দেশ্য রাজস্থানের দর্শনীয় স্থানগুলো পরিদর্শন শেষে যাবো আজমীরে। আজমীর থেকে দিল্লি হয়ে আবার কলকাতা ফেরা। স্লিপিং বার্থ রিজার্ভেশন ছিল আমাদের সেভাবেই। রাত এগারোটায় হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়বে। পৌছাবে ৭ তারিখ ভোর রাতে। অতএব দুই রাত একদিন ট্রেনে কাটাতে হবে। তাই হাওড়া স্টেশন থেকে দুজনে দুটা *হাওয়া কি পিলো,* বা হাওয়ায় ফোলানো বালিশ কিনে নিয়েছিলাম আগেই। ট্রেন ছাড়া মাত্রই আমরা বিছানা পেতে শুয়ে পড়ি। কিন্তু ঘুম আসছে না কিছুতেই। একে তো ট্রেনের আপার বার্থে শোয়ার এটা প্রথম অভিজ্ঞতা, তার উপর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা মোকাবেলা করার আমাদের প্রস্তুতি ছিল যৎসামান্য।

আমাদের বাথের দুটা বাথ পরেই তিনজন মহিলা আর একটা কিশোর বয়সের ছেলের হট্টগোল কানে আসছিল প্রথম থেকেই। মহিলাদের বেশভূষা অতি সাধারণ। বাংলা ভাষাভাষী হওয়ায় ছেলেটাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি তাদের বাকবিতণ্ডার কারণ।

আমার মুখে বাংলা কথা শুনে ছেলেটা যেন হাতের কাছে একটা উপায় পেল।

জানতে পারলাম সে বাংলাদেশি না, কলকাতার। সঙ্গে মহিলারা বাংলাদেশি। তিনজনের বাড়িই ঢাকার নারিন্দায়। যাচ্ছে আজমীর শরীফ জিয়ারতে। সে তাদের গাইড। সমস্যা হলো তাদের দুজনের সিট পড়েছে সামনাসামনি আপার বার্থে এবং একজনের সিট পড়েছে মধ্যম বার্থে। আমাদের মধ্যে প্রায় মধ্যবয়স্ক যে দুজন তারা কেউই আপার বাথে উঠতে রাজি নয়। গাইড ছেলেটা বার বার বোঝাতে চাচ্ছে যে, সে ইচ্ছা করলেই সবগুলো নিচের সিট রিজার্ভ করতে পারতো না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। শেষে ব্যর্থ হয়ে সে তার নিজের বার্থে চলে যায়।

মহিলারা সারা রাত মাঝখানের বাথে বসে গল্প করে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

তাদের গল্পের তোড়ে অবশেষে আমাদের ঘুমের বারোটা তো বাজলোই, তারপর যখন কানে এলো যে, তাদেরই একজন একবার সিলেটের জাফলংয়ে গিয়ে একা সমুদ্র দেখে এসেছে, তখন তো আমার আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। জানি না ওই ট্রেনে কাছাকাছি দূরত্বে কোনো বাংলাদেশি ছিল কি না।

মহিলার গল্প বলার ধরনটা এ রকম : ওই ছোকরা চলে গেলে যাক। ওই সবকে ভয় পাই না আমি। বাংলাদেশ থেকে পুরুষ মানুষ ছাড়া একা এসেছি তো কি হয়েছে। আমার ওপর ভরসা রাখো। এসবে আমি পাকা। একবার সিলেট গেলাম বেড়াতে। সমুদ্র দেখতে চাইলাম। কিন্তু কেউ যেতে চাইলো না। শেষে একাই গেলাম জাফলং। দেখে এলাম কি বিশাল সমুদ্রের ঢেউ।

৬ তারিখ সারা দিন ট্রেনে কাটাতে হবে। চিন্তা করতেই ক্লান্ত লাগছিল। কলকাতা থেকে একটা বাংলা ম্যাগাজিন কিনে নিয়েছিলাম। সেটাই হয়ে উঠলো সময় কাটানোর একমাত্র অবলম্বন।

সারা দিনে ট্রেনে দুই একটা ফেরিওয়ালার দেখা পেলাম মাত্র। দুপুরে খাওয়ার পরে চোখ বন্ধ করে একটুখানি ঝিমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি আমরা দুজন। এমন সময় এলো একদল হিজড়া। এরা নাকি ভিক্ষে করার জন্যে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত। ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে এরা সবার মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু কেউ দুই পয়সা ভিক্ষা দিচ্ছে না দেখে আমার খুব খারাপ লাগলো। আমার স্বামীকে বলতেই সে একটা দুই টাকার কয়েন বের করে একজনের হাতে দিল।

অমনি সে বলে উঠলো, *ভাতে মরা বাঙালি। তোর পয়সা তোর কাছেই থাক*। বলে সে কয়েনটাও ফেরত দিল।

আমরা তো অবাক। ভালোর জন্যে দিলাম। কিন্তু এ কি অবস্থা! অবশ্য পরে এক যাত্রীর কাছ থেকে সব শুনে আমাদের ভুল ভাঙলো। এদেরকে নাকি দশ টাকার নিচে ভিক্ষা দিলে নেয় না। এ জন্যে কেউ সহজে এদের ভিক্ষা দিতে চায় না।

যাই হোক। ৭ তারিখ ভোর পাচটায় আমাদের রাজস্থান অর্থাৎ জয়পুর স্টেশনে পৌছার কথা। আমার সহযাত্রী বাংলাদেশি মহিলাদের গন্তব্য আজমীর এবং ট্রেন পৌছাবে রাত তিনটা সাড়ে তিনটার মধ্যে।

৬ তারিখ সারাদিন ট্রেনে তাদের সঙ্গে বেশ আলাপ-পরিচয় হলো।

রাতের বেলা পানের বাটা সামনে নিয়ে আবারও তাদের গল্প জমে উঠলো। এরই মধ্যে সারা দিন তাদের গাইড ছেলেটার কোনো হদিশ পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই রাতের বেলা একজন আশংকা প্রকাশ করলো। ছেলেটা যদি সত্যিই আর না আসে, এতো রাতে আজমীর স্টেশন তারা চিনবে কি করে।

সিলেটে গিয়ে সমুদ্র দর্শনকারী মহিলা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে ত্রাণকর্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। বিজ্ঞের মতো জবাব দিল। কোনো চিন্তা করিস না। স্টেশন এলে বিমানবালা আগেই ঘোষণা দেবে?

তবে যে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করে বিমোহিত হয়েছি সেটা না বললেই নয়। আমরা যখন রাজস্থানে পৌছালাম তখন স্থানীয় সময় ভোর পাচটা। হাড় কাপানো শীত। তাপমাত্রা পাচ থেকে ছয়ে ওঠা–নামা করছে। কলকাতার তাপমাত্রার সঙ্গে রাজস্থানের তাপমাত্রার এতোটা পার্থক্য আন্দাজ করতে পারিনি বলে আমাদের ভোগান্তি একটু বেশিই হয়েছিল।

স্টেশনে নেমে আমরা গেলাম রেলওয়ে অনুসন্ধান কেন্দ্রে। মনে দ্বিধা। এতো রাতে লোকজন পাবো কি না আর পেলেও বিরক্ত হবে নির্ঘাত। অথচ এর কোনোটাই হলো না। আমরা কর্তব্যরত ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলাম আশপাশে কোথাও মধ্যম শ্রেণীর কোনো গেস্ট হাউস আছে কি না।

ভদ্রলোক স্টেশনের কাছেই একটা গেস্ট হাউসে ফোনে রুম বুকিং দিলেন। তারপর আমাদেরকে বসিয়ে রেখে একটা অটো ডেকে এনে গেস্ট হাউসে পৌছে দিতে বললেন।

বিশ মিনিটের ব্যবধানে আমরা পৌছে গেলাম গন্তব্যে। পৌছে দেখলাম কেয়ারটেকার সেই প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে গেটে দাড়িয়ে আছে আমাদের রিসিভ করার জন্যে।

কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে

দোলা

- রাহাত

আমার বাড়ি চাদপুরে। লাকসামে এসেছিলাম রেলওয়ের নিয়োগের ফরম কিনতে। অনেক কষ্ট করে বারোটার আগেই ফরম নিলাম। কারণ বারোটার সময় লাকসাম থেকে *সাগরিকা এক্সপ্রেস* চাদপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।

বারোটার ট্রেনে এতো ভিড় ছিল যে, ট্রেনে ওঠাই কঠিন হয়ে পড়ছিল। অনেক কষ্ট করে উঠলাম। সিটে বসার কথা তো কল্পনাও করা যাবে না।

তখন দেখি একটি মেয়ে ট্রেনে ওঠার জন্য চেষ্টা করছে, পারছে না। তার এক হাত ধরে টেনে ওঠালাম। বগিতে এতোই চাপাচাপি হচ্ছিল যে, মেয়েটি উঠেছে ঠিকই কিন্তু কোনোদিকে সরতে পারছে না। তখন আমি আর সে মুখোমুখি। আমার মুখ থেকে তার মুখের দূরত্ব এক ইঞ্চির মতো হবে।

অনেকক্ষণ পর ট্রেন যখন স্টার্ট দিল তখন গতির কারণে সে আমার ওপর এসে পড়লো। আবার *সরি* বলে দাড়িয়ে গেল।

ট্রেন চলছে তো চলছেই। আমার আর তার শরীর একেবারে এক সঙ্গে মিশে গেছে সামনাসামনি। এক পর্যায়ে আমার হাত অনিচ্ছাকৃতভাবে তার গোপন অঙ্গে পড়লো।

তখন সে তার হাত দিয়ে আমার হাত সরিয়ে দিল।

তখন বললাম, সরি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, তার ঠোট দুটো এতো আকর্ষণীয় ছিল যে, আমার ইচ্ছা হচ্ছিল তার ঠোটে চুমু বসিয়ে দিই।

হঠাৎ করে ট্রেন ঝাকি দিল। তখন অন্য সবার অলক্ষ্যে আমার ঠোট দুটি তার ঠোটের ওপর চেপে ধরলাম।

সে লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

যেহেতু আমি আর সে মুখোমুখি ছিলাম, তাই তার কানের কাছে গিয়ে বললাম, আপনার ঠোট দুটি খুব সুন্দর।

তখন সে আলতো করে হাসলো।

এরপর তার সঙ্গে আরো অনেক কথা হলো এবং আরো কিছু ঘটে গেল এই ভিড়ের মাঝে। হঠাৎ ট্রেন থেমে গেল। মানে চাদপুরে চলে এসেছে।

তখন আমি ওই বগির এক দরজা দিয়ে, সে অন্য দরজা দিয়ে নেমে গেল।

বাসায় যাওয়ার জন্য একটা রিকশায় উঠলাম। তখন দেখি সেও একটি রিকশায় উঠছে।

আমরা দুজন দুজনকে হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। ট্রেন ভ্রমণের এই ঘটনাটি আজো আমার মনে দোলা দেয়।

চাঁদপুর থেকে

শুকতারা

- অমিত

গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম আমার। ম্যাট্রিক পাস করার পর আমরা দুই বন্ধু এক শুভাকাঙ্ক্ষীর মাধ্যমে প্রথম লোকাল ট্রেনে গ্রাম থেকে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে যাই ভর্তির উদ্দেশ্যে এবং ভাগ্য অনুকূলে থাকায় ডিপ্লোমা-ইন-কমার্সে ভর্তির সুযোগও হয়ে যায়।

মানুষ অকৃতজ্ঞ এবং স্বীকার করছি, আমি বোধহয় আরো একটু বেশি। তা না হলে সেই শুভাকঙ্ক্ষীকে ভুলেই গিয়েছিলাম যার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞতার দায়ে আবদ্ধ। সে ছিল গ্রামের মরসুমি কাজ করতে আসা আমাদের বয়সের এক বিদেশি কৃষি শ্রমিক। তার নাম, সে কোথায় আছে এবং বেচে আছে কি নেই তাও আমার জানা নেই। সেই থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের চট্টগ্রাম-নাজিরহাট শহরমুখী ভোরের লোকাল ফার্স্ট ট্রেন এবং বিকাল চারটার ফেরত ট্রেন ছিল আমার কলেজে যাওয়া-আসার বাহন।

যার কারণে ট্রেন ভ্রমণে সমর্থ হয়েছিলাম তিনি আমার প্রয়াত মা। নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রামীণ পরিবারের ছেলে শহরে গিয়ে পড়া, এতোদূর পথ ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা, ভোর সকালে খাবার খেয়ে রওনা হওয়া এবং বাড়ি থেকে এক মাইল দূরত্বে গিয়ে ট্রেন ধরা, সব কিছুই আমার মা না হলে সম্ভব হতো না।

আড়াই বছরের মতো চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে যাওয়া-আসা করেছি। একদিনের জন্যও মা আমাকে ঘুম থেকে ওঠাতে এবং ট্রেন ধরার জন্য আমাকে তৈরি করাতে ব্যর্থ হননি।

তখন আমাদের ঘরে কোনো ঘড়ি ছিল না। সকালের শুকতারা ছিল আমার মায়ের ঘড়ি। আর এখন আমাদের স্ত্রীরা নাকি আমাদেরকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। সেই ছাত্র জীবনের মতো প্রবাসেও আমাকে অফিসের উদ্দেশ্যে সাতসকালে বেরুতে হয়। রেগুলার নাশতা খাওয়া দূরে থাক, ঘরে এলার্ম ঘড়ি না রেখে আমার মায়ের মতো স্ত্রীর ওপর নির্ভর করলে হয়তো এতোদিনে চাকরি খোয়াতে হতো।

আজ আরো স্মরণ হচ্ছে সেসব সহযাত্রীদের কথা যাদের মধ্যে ছাত্র ছিল, বড় ভাইয়ের বয়সের লোক ছিলেন এবং এমনকি বাপ-চাচার বয়সের লোকও ছিলেন। ট্রেনে আসা-যাওয়াতে আমরা একটা দল প্রত্যেক দিন একই নির্দিষ্ট বগিতে বসতাম এবং আড্ডার মধ্য দিয়েই কখন গন্তব্য এসে যেতো আমরা টেরই পেতাম না।

এভাবে পলিটেকনিকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে, চট্টগাম ইউনিভার্সিটিতে হিসাব বিজ্ঞানে ভর্তি হলাম।

তারও যাতায়াতের মাধ্যম ছিল ট্রেন। কিন্তু বিধি বাম।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে আমার ইউনিভার্সিটি জীবনের ইতি টেনে চাকরি জীবনে ঢুকতে হয়েছিল। তবে লেখাপড়া থেমে থাকেনি। চাকরি ছিল চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে এবং যাতায়াত ছিল ট্রেনের মাধ্যমে।

সকাল আটটার ট্রেনে গ্রাম থেকে যেতাম এবং সন্ধ্যা ছয়টার ট্রেনে ঘরে ফিরে আসতাম। কখনো আগ্রাবাদ কমার্স কলেজে রাতে কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টের ক্লাস থাকলে শেষ ট্রেনে বাড়ি ফিরতে হতো।

তখন দেখতাম আমার মা কুপি জালিয়ে আমার আসার পথে বসে আছেন।

তখন না বুঝে মাকে বকা দিতাম আমার পথ চেয়ে বসে থাকতেন বলে।

লেখার এই পয়েন্টে এসে চোখের পানি ধরে রাখতে পারলাম না। দাত থাকতে যেমন মানুষ দাতের কদর বোঝে না, তেমনি মা–বাবা থাকতেও প্রায় লোকই মা–বাবার কদর বোঝে না।

চাকরি জীবনের ট্রেন ভ্রমণেও এক দল বন্ধু পেয়েছিলাম যাদের কথা এই নিষ্ঠুর প্রবাস জীবনে অহরহ মনে পড়ে। জানি না আমার কথা তাদের মনে আছে কি না। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মামা মোস্তফা, জানে আলম, জামাই, গোপাল, অমৃত বড়ুয়া এবং আরো অনেকে। আমার ভালো গানের গলা ছিল এবং হেমন্ত ও জগন্ময় মিত্রর গান প্রায় হুবহু গাইতে পারতাম। আমার গান আমাদের আড্ডার অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

মাঝে মধ্যে অনেক সুন্দরী মহিলারা উকি–ঝুকি দিতো এবং অনেকে গা ঘেষতেও চেষ্টা করতো। কিন্তু আমি গ্রামের কোনো এক অবলার প্রেমে তখন হাবুডুবু খাচ্ছিলাম বলে সাড়া দিতে পারিনি।

ট্রেন ভ্রমণ লেখার মাধ্যমে পাঠকদের যে মেসেজ দিতে চাই তা হলো, অধ্যবসায়, পরিবারের প্রতি কমিটমেন্ট, টেকনিকাল শিক্ষা এবং মেহনত করতে পারলে আল্লাহ ছাড়া কারো মুখাপেক্ষী হতে হয় না এবং পেছন ফিরে তাকাতে হয় না।

আমি যখন চাকরি নিতে বাধ্য হই তখন আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ইন্টারমিডিয়েট সমমান এবং পলিটেকনিক শিক্ষার বদৌলতে ইংরেজি টাইপ ও শর্টহ্যান্ড দক্ষতা।

বাংলাদেশে থাকতে কয়েকবার চাকরি বদল করেছি। পরে দেখলাম মধ্যপ্রাচ্যে আমার কাজের চাহিদা প্রচুর। কিন্তু যাই কি করে? তখন চাচা, মামা বা ভিসা কিনে যাওয়ার মতো টাকা আমার ছিল না। মনে করলাম ঢাকা থাকলে হয়তো কোনো সুযোগ এসে যেতে পারে। তাই ঢাকায় স্টেনোগ্রাফারের একটা কাজের ব্যবস্থা করলাম। অফিস এবং থাকার জায়গা ছিল ধানমন্ডি তেত্রিশ নাম্বার রোডে। সকালে নাশতা করতে যেতাম সোবহানবাগে এক রেস্টুরেন্টে।

একদিন সেখানে বসেই দেখতে পেলাম ইত্তেফাক পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন। বিদেশ যেতে আপনার চাচা, মামা নেই, কোনো চিন্তা নেই, আমাদের কাছে আসেন, আমরা আপনাকে টাকা ছাড়া সাহায্য করবো।

যে উদ্দেশ্যে ঢাকা আসা, দেখি তারই প্রতিচ্ছবি। দেরি না করে ঠিকানা ধরে তাদের কাছে গেলাম এবং তারা পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে আমাকে একটা জব গাইড ধরিয়ে দিল।

এই গাইড নিয়ে বাসায় এসে মধ্যপ্রাচ্যের পছন্দের দেশগুলোর বিভিন্ন কম্পানিতে বায়োডাটা পাঠাতে লাগলাম। ছয় মাস চিঠি লিখে কোনো উত্তর না পেয়ে মনস্থ করলাম এখানে নয়, চট্টগ্রাম থেকে চিঠি লেখা চালিয়ে যাবো। চট্টগ্রামে একটা শিপিং কম্পানিতে কাজের ব্যবস্থা করে ঢাকার চাকরি ছেড়ে দিলাম।

চট্টগ্রাম আসার পাচ ছয় মাস পর একদিন দেখলাম শাদা খামে আমার নামে জেদ্দা থেকে একটা চিঠি। খাম খুলে দেখলাম আমার জন্য তিন মাসের ট্রায়ালে একটা স্টেনো সেক্রেটারির চাকরির অফার।

সেই দিনটা আমার জীবনে কি যে আনন্দের দিন ছিল তা লেখায় প্রকাশ করা অসম্ভব। অফিস থেকে বের হয়ে চারটার ট্রেন ধরে মায়ের কাছে গিয়ে বললাম।

মা প্রথম থেকেই আমার বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে নিমরাজি ছিলেন। যখন দেখল আমি জেদ্দা যাবো অর্থাৎ মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফের দেশে তখন মাও খুশি হলেন এবং বললেন, আমি হজ করতে পারবো।

মায়ের সে আশা পূরণ হয়েছিল। এই কম্পানি থেকে আমি ভিসা, টিকেট সব ফৃ পেয়েছিলাম।

আমার ট্রেন সহযাত্রী মামা মোস্তফা একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করতেন। তাই আমাকে জানুয়ারি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ বিমানে জেদ্দা পৌছাতে কোনো বেগ পেতে হয়নি।

জেদ্দা এসে খুব ভালো বেতনে কাজ শুরু করলাম এবং ১৯৯১ পর্যন্ত এই কম্পানিতে কাজ করেছি। তারপর জেদ্দাস্থ একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্থ সংস্থায় কাজ পাই এবং এখনো কর্মরত।

আগ্রাবাদ অফিস থেকে ট্রেন ধরতে আমি বটতলী স্টেশন পর্যন্ত হেটে আসতে অনেক সময় ঝড় বৃষ্টি আসতো। তখন যে বাড়ির ছায়ায় দাড়িয়ে আশ্রয় নিতাম, এখন চট্টগ্রামে সে রকম একটা বাড়ির মালিক আমি।

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর রহমত, আমার অধ্যবসায়, মেহনত এবং পরিবারের প্রতি কমিটমেন্টের ফলে আমার মনে হয় এতোটুকু সফল হতে পেরেছি। পরিবারের প্রতি কমিটমেন্ট বলতে বোঝাতে চেয়েছি, পিতার অবর্তমানে নিজের সুখের চিন্তা না করে পরিবারের সদস্যদের সুখী দেখার চিন্তা।

পাঠকদের মধ্যে আমার মতো গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্তের সম্ভাবনাময় কেউ যদি থাকেন, আমার পরামর্শ হবে পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি শর্টহ্যান্ড, টাইপ ও কমপিউটার শিক্ষা আয়ত্ত করবেন এবং পরিবারের প্রতি কমিটমেন্ট ঠিক রাখবেন, রাজনীতি থেকে দূরে থাকবেন, অধ্যবসায়ী (অর্থাৎ একবার না পারিলে দেখ শতবার) হতে চেষ্টা করবেন, মেহনতী হওয়ার চেষ্টা করবেন এবং আল্লাহ ছাড়া পারতপক্ষে কোনো মানুষের মুখাপেক্ষী হবেন না। ইনশাআল্লাহ সফলতা আপনা থেকেই আসবে।

আমি যে সংস্থায় কাজ করি সেখানে প্রতি বছর স্টেনোগ্রাফারের প্রয়োজন হয়। প্রথম প্রথম আমাদের টিম বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে গিয়ে রিক্রুট করে আনতো। ইদানীং তারা বাংলাদেশে যায় না। বলছে, বাংলাদেশে এখন বাংলায় লেখাপড়া হয়। তাই ইংরেজি জানা লোকের অভাব।

এটাও বাঙালিদের বিরুদ্ধে আমাদের পাকিস্তানি ভাইদের একটা চক্রান্ত। গত দুই তিন বছর যাবৎ তারা শুধু পাকিস্তানে গিয়ে প্রায় পঞ্চাশজনের মতো স্টেনোগ্রাফার নিয়ে এসেছে।

আমরা জেদ্দা দূতাবাস এবং দেশের প্রবাস মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জড়িতদের অনেক বলেছি। যাযাদির মাধ্যমেও আবার বলছি যে, এই পাকিস্তানি চক্রান্তে অনেক বাঙালিভাই মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ভালো ভালো সংস্থায় চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সময় থাকতে আপনারা এটার বিরুদ্ধে কিছু করুন।

আরো একটা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশে থেকে সউদি আরবের বিভিন্ন কম্পানিতে লোক পাঠানো হচ্ছে আড়াইশ থেকে তিনশ রিয়াল বেতনে। অপর পক্ষে ইনডিয়া, শ্রী লংকা সরকার ছয়শ রিয়াল বেতনের কমে কোনো লোকই পাঠায় না। বাংলাদেশ থেকে যারা আসে তাদের খরচ পড়ে দুই লাখ টাকার মতো। আর ইনডিয়া, শ্রী লংকা থেকে এলে খরচ পরে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো। এদের টিকেট কম্পানি থেকে দেয় এবং স্থানীয় খরচও কম্পানি বহন করে। শ্রমিকদের থেকে নিতে পারে শুধু এজেন্সি ফি যেটা ইনডিয়া, শ্রী লংকায় নেয়া হয়। কিন্তু এই শ্রমিকদের দুই লাখ টাকা খরচ হওয়ার পেছনে রহস্য কি? আর জেদ্দায় একজন লোকের মাসিক খরচও আছে কমপক্ষে তিনশ রিয়াল। তাহলে এই লোকগুলোর সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে কেন তাদেরকে অনিশ্চয়তার পথে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে? এই সুযোগহীন গরিব লোকগুলো বিদেশে না এসে দেশে দুই লাখ টাকায় একটা সিএনজি কিনে চালালেও তো ডেইলি কমপক্ষে পাচশ টাকা আয় করতে পারে।

সে যাই হোক। এখনো দেশে গেলে গ্রাম থেকে আটটার ট্রেন ধরে শহরে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু আগের সেই আড্ডার একটা লোকও পাওয়া যায় না। আমাদের এই গরিব দেশ ও গরিব বাংলাদেশ রেলওয়ের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। উন্নত জীবন ও উন্নত দেশের হাতছানি আমার অন্তরের অন্তস্থলে এদের আকর্ষণ একটুও কমাতে পারেনি। আমি আমার গরিব দেশকে এবং আমার মা যিনি আমার জীবনের শুকতারা তাকে ভালোবাসি। এদের অভাব এখনো বেশি অনুভব করি।

চেষ্টা করছি আমার সন্তানদের আপাদমস্তক বাঙালি মুসলমান বানাতে। তারা যেখানেই থাকুক বাংলা যেন তাদের অন্তর জুড়ে থাকে এবং সময়-সুযোগ পেলে তারা যেন বাংলার ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে উচু করতে চেষ্টা করে।

জেদ্দা থেকে

amit2hassan@yahoo.com

শিয়ালদহ টু বনগা

- মাউদুদা খাতুন

কলকাতা যেতে বা কলকাতা থেকে আসতে বনগার ট্রেন ব্যবস্থার জুড়ি নেই। বেনাপোল থেকে কলকাতা যেতে প্রাইভেট ট্যাকসি বা অন্য কোনো যানবাহনে হয়তো নিজের মতো করে যাওয়া যায়। কিন্তু সবার সঙ্গে একই পথের পথিক হওয়ার আনন্দই আলাদা। সেই সবার মধ্যে থাকে ধর্মের ব্যবধান, বয়সের ব্যবধান, শিক্ষা-দীক্ষা, চালচলনের ব্যবধান, আরো থাকে বিভিন্ন পেশাজীবী, বিভিন্ন কর্মজীবী মানুষদের মনমানসিকতার বিস্তর ব্যবধান। তা সত্ত্বেও আমাদের একটি জায়গায় খুবই মিল, আমরা সবাই মানুষ। তাই অনুভূতিশীল একজন মানুষ হিসেবে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষদের বিভিন্ন আচার আচরণ দেখতে দেখতে ট্রেন জার্নি খুবই উপভোগ্য আমার কাছে।

তবে কেন জানি না কলকাতা যাওয়ার চেয়ে কলকাতা থেকে বাংলাদেশমুখী হওয়ার মধ্যেই বেশি আনন্দ, বেশি উত্তেজনা অনুভব করি। যখন শিয়ালদহ স্টেশনে টিকেটের জন্য বিরাট লাইনে দাড়িয়ে টিকেট কাটতে হয় তখন বাড়ি ফেরার তীব্র আকঙ্ক্ষায় মনে হয়, এ লাইন যেন শেষ হবে না। এতো মন্থর তার গতি। ট্রেন মিস হয়ে গেলে আবারও পরবর্তী ট্রেনের জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু টিকেট মাস্টারের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তার কোনো তাড়া নেই। তিনি টাকা নিচ্ছেন, কমপিউটারে হিসাবে মিলাচ্ছেন, টাকার ভাংতি গুণতে গুণতে আমাদের নাভিশ্বাস উঠিয়ে ফেলছেন। তিনি নির্বিকার।

ছেলেদের বিরাট লাইন দেখে বাচ্চার আব্বাকে না পাঠিয়ে আমি মেয়েদের লাইনে গিয়ে দাড়ালাম। অল্প কয়েকজন মহিলা দেখে আশান্বিত হলাম যে, আমার টিকেট পেতে দেরি হবে না। কিন্তু হা হতোস্মি! তিনজন পুরুষের পরে একজন মহিলা। ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিতে দিতে লক্ষ্য করলাম এক মহিলা ফটকাবাজ-এর চাতুরিপূর্ণ কার্যকলাপ। সে মুখে প্রতিবাদে সোচ্চার আওয়াজ তুলে এগোতে এগোতে একেবারে পেছন থেকে এসে আমাদের টপকে একেবারে কাউন্টারে হাত ভরে টিকেট নিতে চাচ্ছে। প্রথমে একটু ঘাবড়ে গেলেও ওই মহিলাকে বললাম, লাইনে আসুন। তিনজন পুরুষের পর একজন মহিলা যেভাবে টিকেট নিচ্ছে, আপনাকেও সেভাবে নিতে হবে।

এতে কাজ হলো। মহিলাটি কোনো দ্বিরুক্তি না করে সুড়সুড় করে পেছনে গিয়ে দাড়ালো।

আসলে শিয়ালদহ জায়গাটি বিভিন্ন ধরনের বাটপাড়দের জায়গা। একটু এদিক ওদিক বেখেয়াল হলেই হলো। মালপত্র গায়েব হয়ে যাবে, নয় তো পকেটমার হয়ে যাবে। তাই শিয়ালদহ স্টেশনে সব সময় চোখ কান খোলা রেখে চলতে হয়। একটুখানি অসাবধান হলেই মহা সর্বনাশ হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা।

এবার একজন মহিলা আমার সামনে। কাছ থেকে দেখলাম তিনি দুটি টিকেট নেবেন, অথচ তিনি কাউন্টারে দিলেন ৫০০ টাকার একটি নোট। কাউন্টারে বসে থাকা টিকেট দাতা অবলীলায় টাকাটি নিলেন, কমপিউটারে হিসাব মেলালেন এবং যথানিয়মে খুচরা পয়সা গুণতে শুরু করলেন। এরপর আরো তিনজন ছেলের বেলাতেও ওই একই ঘটনার পুরাবৃত্তি।

যখন আমার সুযোগ এলো, আমি তিনটা টিকেটের নোট ও ভাংতিতে দিলাম এবং সহজেই নিষ্কৃতি পেয়ে লাইনের বাইরে এসে দাড়ালাম। মনে হলো কাউন্টারে বসে থাকা লোকটিকে একটু উপদেশ দিয়ে বলি যে, আপনি যতোক্ষণ খুচরা পয়সা গুণে সময়ক্ষেপণ করছেন, তাতে বহু মানুষেরই অসুবিধা হচ্ছে, অথচ যদি একটা সাইনবোর্ডে লিখে দেন পয়সা ভাংতি দেবেন তবে অবশ্যই ইনডিয়ানরা ও অন্য দেশীয়রা তা অনুসরণ করবে। এতে সবারই সময় ও পরিশ্রম উভয়ই বাচবে। সে সাহস হলো না। মনে মনে চিন্তা করলাম, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বা যেখানে যেখানে টাকার লেনদেন হয় সেখানে বা সেসব জায়গায় যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা না দেয়ার পদ্ধতি চালু করা যেতো তাহলে দেখা যেতো সময় ও পরিশ্রম উভয়েরই

সাশ্রয় হচ্ছে। ইনডিয়ায় যেকোনো লাইনে দাড়ালেই দেখা যায়, তাদের খুচরা পয়সার মূল্য থাকার কারণে তারা শেষ পাই পয়সাটিও ছাড়ে না। এবং বাংলাদেশিরা পঞ্চাশ-একশ পয়সা তো দূরের কথা, দুই তিন টাকাও না নিয়ে অনেকে কাউন্টার ছাড়ে। এতে করে যেসব খুচরা পয়সা বাড়তি হয় তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা না হলেই তো সেখান থেকে দুর্নীতির জন্ম হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেবে।

যাই হোক। টিকেট পেয়ে প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষার পালা শুরু হলো। যদিও ঘণ্টায় ঘণ্টা ট্রেন তবুও কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাড়াবে তা কেউই না জানার কারণে ট্রেনের জন্য হাপিত্যেশ করে দাড়িয়ে থাকতে হয়। তখন আশপাশে তাকালে দেখা যায় মানুষ যেন পানির ঢলের মতো ছুটে চলছে। মুখে কথা নেই, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, শুধুই ছুটে চলা নিজ নিজ গন্তব্যের দিকে। একটু খেয়াল করলে আরো দেখা যায় বনগাগামী যাত্রীদের অনেকেই বাংলাদেশি। তাদের বেশির ভাগই সেখানে গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। আবার অনেকে বেড়াতেও গিয়ে থাকেন।

ট্রেন কতো নাম্বার প্ল্যাটফর্মে দাড়াবে জানার পর সবাই ট্রেনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম কুলির মাথায় বাক্সপত্র চাপিয়ে দিয়ে। এই কুলির ব্যাপারটি এখনো বড় অমানবিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। কষ্ট লাগে। কিন্তু আমাদের এখানে করারও কিছু নেই। অথচ যদি বিমানের মতো ট্রলির ব্যবস্থা থাকতো তাহলে আমরাই নিজেদের মালপত্র বহন করতে পারতাম। কুলিও মানুষ, আমিও মানুষ। সে দুটো পয়সার জন্য এভাবে তার শ্রম বেচছে আর আমরা শ্রম বিমুখ মানুষরা পয়সার বিনিময়ে তাদের ব্যবহার করছি। অন্যভাবে দেখলে এটাও সত্য যে, অন্য কোনো কায়িক পরিশ্রম করে পয়সা উপার্জনের পথ জানা থাকলে তারাও হয়তো এ কাজ করতো না। উপায়ান্তরহীন হয়েই হয়তো তাদেরকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে। কুলি দেখলেই কবি নজরুল ইসলামের *কুলি* কবিতাটি মনে পড়ে যায়। অমিতাভ বচ্চন অভিনীত *কুলি* চরিত্রটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কষ্টটা কি সে জন্যই বেশি করে বিঁধে, কে জানে!

সকালের খালি ট্রেনে উঠে ইচ্ছামতো জায়গায় বসার একটা সুবিধা যেমন পাওয়া যায় তেমনি অন্য রকম একটা আনন্দও অনুভব করার সুযোগ থাকে। কোনদিকে রোদ লাগবে বা কোন দিকের জানালায় বসলে চোখে কয়লার ছিটা এসে লাগবে না এসব কিছু বিবেচনা করে ইচ্ছামতো একটা সিটে বসার জন্য ট্রেনের বগিটা কিছুক্ষণের জন্য কিছুটা ফাকা পাওয়া যায়। পরে ট্রেন চলতে শুরু করার পর সব স্টেশনে থামতে থামতে প্রতিটা স্টেশন থেকে লোক নিতে নিতে ট্রেনের ভেতরে মানুষের গাদাগাদিতে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। অবস্থা শেষে এমন দাড়ায় যে, দুই জানালার মাঝখানে পা দোলানোর মতো যে ফাকা জায়গাটুকু থাকে সেখানে পা রাখাও দায় হয়ে পড়ে। পুরুষ, স্ত্রীলোক ভেদাভেদ নেই। যার ইচ্ছে সে সেখানে ঢুকে যতোটা সম্ভব শরীরটাকে দুমড়ে-মুচড়ে দাড়িয়ে যায়।

ইনডিয়ার সব জায়গায় নারী-পুরুষের সমান অধিকার না থাকলেও এই ট্রেন জার্নির সময়ে তারা যে পূর্ণ সমান অধিকার ভোগ করে তাতে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। আমরা যেখানে চরম অস্বস্তি বোধ করছি সেখানে ওদেশীয় নারী-পুরুষরা স্বচ্ছন্দে মেনে নিচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় এ তাদের নিত্যদিনের অভ্যাস, একদম গা সওয়া। অথচ আমরা যারা বাংলাদেশি যাত্রী তাদের তখন নাক কান মলার মতো অবস্থান। মনে হয় প্রতিজ্ঞা করি, জীবন থাকতে আর এ ট্রেনে যাবো না। কিন্তু প্রতিবারই বাংলাদেশ ফেরার সময় সে কথা ভুলে যাই। আবারও শিয়ালদহ টু বনগা ট্রেনে উঠি, আবারও বিরক্ত হই, আবারও প্রতিজ্ঞা করি, আবারও ভুলে যাই।

এই আসা-যাওয়া করতে করতেই দেখেছি অফিসগামী যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর গাদাগাদিটা একটু কমে এলেই ট্রেনের মাঝখানে দাড়িয়ে থাকা অপর মানুষগুলো সহ্যসীমার মধ্যে এসে যায়। তখন পাশে বসে থাকা মানুষগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলাপচারিতা জমে ওঠে। তারা অনেক কিছুই এ দেশ সম্বন্ধে জানতে চান। আমরা বলি, তারা শোনেন। তবে তাদের কথা শুনে বুঝতে পারি, এ দেশ সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা অনেকখানি যা ট্রেনের আলাপচারিতার মধ্যে কোনোক্রমেই দূর করা সম্ভব নয়। গল্প করতে করতেই লক্ষ্য করি বিভিন্ন

ধরনের পশরা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফেরিওয়ালারা গলা ফাটাচ্ছে। তাদের শস্তা কিন্তু সেরা জিনিসটি বেচার জন্য যতো রকমের কথা বলার প্রয়োজন মনে করছে ততো রকমের কথা বলে ক্রেতা আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন। বাংলাদেশে পারতপক্ষে দশ টাকায় কোনো জিনিস কেনা সম্ভব নয়। তাই ট্রেনে যখন দশ টাকায় কেউ চারটি পেন বা পাচটি পেন বিক্রি করে তখন তা কিনতে খুবই ভালো লাগে। তবে শস্তা হলেও পেনগুলোর লেখা মন্দ নয়। আমার ছোট মেয়েটাও দশ বিশ টাকা নিজ হাতে খরচ করে কিছু একটা কিনতে পারাটা খুব উপভোগ করে।

আরো লক্ষ্য করেছি কলকাতার নিউ মার্কেটে যে মোজা দশ টাকায় পাওয়া যায়, ট্রেনে শস্তা জিনিস বিক্রেতা ফেরিওয়ালারাও ওই মোজা দশ টাকাতেই বিক্রি করছে। ব্যাপারটা আমাদের দেশে ভাবাই যায় না। খোজ নিয়ে জেনেছি কম্পানি কর্তৃক বেধে দেয়া দামের বাইরে তারা এক পয়সা বেশি বলার মুরোদ যেমন রাখে না তেমনি এক পয়সা কম নেয়ার সাধ্যও তাদের নেই। এতে নাকি তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে। তার জন্য বাধ্যবাধকতার কারণেই কি না জানি না, তারা আমাদের দেশের খুচরা বিক্রেতাদের মতো অতি মুনাফাখোর নয়। দিনকে রাত বানিয়ে তারা জিনিস বেচে না। অবশ্য তারা যে মানুষ ঠাকায় না, এ কথা বলছি না। তবে তার সীমা আছে।

ট্রেনের ভেতর আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো। খবরের কাগজ বা ম্যাগাজিন নিয়ে ট্রেনে উঠলেও ট্রেন থেকে নামার সময়ে তা যে আপনার হাতে থাকবে এমন নিশ্চয়তা নেই। খবরের কাগজ পড়তে দেখলে বা ম্যাগাজিনটা না পড়ে পাশে রাখলেই দাদা, একটু দেখি বা দিদি, একটু দেখি বলে চেয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করবে। আপনার সঙ্গে তার ট্রেনে আলাপ হোক আর না হোক। তারপর খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনটা হাত ঘুরে ঘুরে যে কার কাছে পৌছাবে তার হদিসই পাওয়া যাবে না। তবে একটু সচেতন থাকলে ও লজ্জার মাথা খেয়ে ওগুলো চেয়ে নিলে তবেই আবার আপনি আপনার মালিকানায় ফিরে পাবেন আপনার জিনিস। এ কথা সত্য, তারা পড়াশোনা করে। বই বা খবরের কাগজ দেখলেই যারা হাত পাতে তারা যে পড়ার প্রতি কতোটা আগ্রহী তা আর বুঝিয়ে কলার অপেক্ষা রাখে না যা আমাদের দেশে সচরাচর দেখা যায় না। ইদানীং অবশ্য আমাদের দেশে *বইমেলা*–য় প্রচুর লোক সমাগম হচ্ছে। সেখানে প্রচুর বই বিক্রি হচ্ছে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বই পড়ার জন্য ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার নিয়ে আগ্রহী পাঠকদের কাছে পৌছে যাচ্ছে। তবুও ইনডিয়ানদের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি এখনো পর্যন্ত। তার কারণ কি? আসলে ওদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে বিদ্যার দেবী স্বরস্বতী। তাই ধর্মের প্রভাবেই তারা বিদ্যা শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত। অন্যদিকে ওই দেশের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা বিমুখ। ফলে হিন্দুরা যেখানে শিক্ষা–দীক্ষায়, চাকরি–বাকরিতে অগ্রসরমান সেখানে মুসলমানরা ততোটাই পিছিয়ে।

হয়তো সে দেশের মুসলমানদের আর্থিক অসচ্ছলতাকেও কিছুটা দায়ী করা যায়।

যাই হোক। শিক্ষায়–দীক্ষায় এগিয়ে থাকলেও চলন্ত ট্রেনে দেখেছি তাদের অতি সাধারণ চালচলন, কথাবার্তা। বিলাসিতার ছাপ বিন্দুমাত্র চোখে পড়েনি যা আমাদের দেশে কল্পনাও করা যায় না।

আর এদেশে যেটা কল্পনাও করা যায় না সেটা হলো ওদের সাম্প্রদায়িকতা। নিজেরা খুব সাম্প্রদায়িক হওয়ার কারণে তারা আমাদের দেশেও সেটা আবিষ্কার করার নিরর্থক চেষ্টা করে। তাদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রমাণের জন্য এতোটুকুই বলাই যথেষ্ট যে, তাদের দেশে চা বিক্রেতারাও সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারটি মাথায় রেখে তারা চায়ের কাপ হিসেবে মাটির ভাড় বা প্লাস্টিকের ছোট ছোট পাত্র ব্যবহার করে যা একবার ব্যবহারের পরই ফেলে দিতে হয়। একবার ব্যবহার করার পর ফেলে দেয়া পাত্রের পেছনে তারা যে কতো পয়সা অপচয় করছে তার হিসাব করতে গেলে যে কেউই অবাক হবেন। এটা তারা করে হিন্দু সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের ছোয়াছুয়ি থেকে বাচাতে যা তাদের মজ্জাগত।

আমরা কলকাতা গিয়েছিলাম ছোট মেয়ের অ্যাকসিডেন্ট পরবর্তী চিকিৎসা করাতে। অথচ সত্যি বলতে কি, অ্যাকসিডেন্টের পরে ছোট মেয়েটির যে অপারেশনটি বাংলাদেশে হয়েছিল তার অকুণ্ঠ প্রশংসা কলকাতার ডাক্তাররা করেছেন। তারপরও আমাদেরকে ছোট মেয়েটিকে নিয়ে কলকাতা যেতে হয়েছিল। যদি এখানকার ডাক্তাররা অ্যাকসিডেন্ট পরবর্তী শরীরের থরোলি চেকআপ করার পরামর্শ দিতেন তাহলে আমাদের মতো ছাপোষা মানুষদের ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য কলকাতা যেতে হতো না। অথচ কলকাতার আর্থোপেডিক এক ডাক্তার আমার ছোট মেয়েটির অবস্থা দেখে নিজ দায়িত্বে তার চিকিৎসা করেছেন যা আমাকে চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। অবশ্য আমি মুখের মধ্যে নিখুত অপারেশন করার জন্য বাংলাদেশি ডাক্তার ওরাল অ্যান্ড ম্যাটৃল ফেসিয়াল সার্জনের কাছেও সমভাবে কৃতজ্ঞ। এই প্রসঙ্গটাও ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠল। তারা আমার মেয়ের চোখের নিচের পাতায় প্লাস্টিক সার্জারির নিখুত কাজ দেখে বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, এতো সুন্দর যে দেশের ডাক্তারদের অপারেশনের হাত তাদের দেশের রোগীরা কেন কলকাতায় আসে?

অ্যাকসিডেন্টের পরে যে সহমর্মিতা, আন্তরিকতা ও দায়িত্ব নিয়ে রোগীর আরো আনুষঙ্গিক চিকিৎসা করার কথা তা পাইনি বলেই যে কলকাতা আসা সেটাতো আর বলা যায় না! নিজেদের কাধে দোষটা নিয়ে বললাম, এই একবার দেখিয়ে গেলাম আর কি!

তারা ভিমরি খেলেন। তারা হিসাব মেলাতে পারলেন না। আমি ও আমার স্বামী নীরব থাকলাম।

ট্রেনের যাত্রীদের সঙ্গে এই আলাপচারিতা শেষ হবার আগেই ট্রেন বনগা স্টেশনে এসে থামলো।

আমাদের কাছ থেকে আর কোনো উত্তরের আশা না করে সবাই যে যার বাক্সপেটরা নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আমরাও নেমে পড়লাম।

পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা থেকে

ম্যাডাম

হু হু করে ছুটে চলছিল *সুবর্ণ এক্সপ্রেস*। গতি ত্রিশ চল্লিশ মাইল। যাচ্ছিলাম খুলনা। নতুন আত্মীয়ের বাড়ি। সঙ্গে উপহার স্বরূপ আশি নব্বই কেজি মরসুমি পাকা আম। এ সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব সর্বদা আমারই পালন করতে হয়। আমি যে পরিণত বয়স্ক তা নয় আবার অপরিণতও নয়। আমার পা পড়েছিল শিক্ষা জীবনের একাদশ বছরে। সালটা ১৯৯৮।

হরতাল থাকার কারণে বিকাল পাচটার টিকেট কাটলাম সুবর্ণ এক্সপ্রেসে। ট্রেনের একটা সেকেন্ড ক্লাস বগিতে ছিলাম। ভিড় ছিল বেজায়। পাচজনের সিটের মাঝখানের ছত্রিশ নাম্বার সিটটি আমার দখলে। মাথার উপরের হ্যাংগারে আমার ফলের কার্টন দুটি। সেদিকে প্রায়ই নজর দিতে হচ্ছে। এসব ট্রেনে আবার মালপত্র হাওয়া হয়ে যাওয়ার রেওয়াজ আছে।

আমার বামপাশে জানালার ধারে বসেছিলেন এক মহিলা, সামনের জানালার পাশের সিটটিতে বসেছিলেন এক মধ্যবয়স্ক লোক। সম্ভববত মহিলাটি সঙ্গের। লোকটি মনোযোগের সঙ্গে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে বাদাম খাচ্ছিলেন। ঝাকুনিতে যদিও তার একটু অসুবিধা হচ্ছিল বুঝতে পারছিলাম।

আমার পাশের সিটটিতে সত্তরউর্ধ এক নানা ও তার নাতি।

পাশের সিটটিতে দুটি ভদ্রলোক মুখ হা করে ঘুমাচ্ছিলেন।

মাঝখানে করিডোর এবং একেবারে ওই পাশে এক বস্তির মহিলা। শাড়িটি আধময়লা। ছেড়া ব্লাউজটি বগলের পাশে ফেসে গেছে। কোলের শিশুটি কাদছে...।

এর মধ্যে টিটিরা টিকেট চেক করে গেছেন।

ইদানীং খুব টিকেট চেক হচ্ছে। এতো কড়াকড়ি আগে ছিল না।

করিডোর ধরে কিছু লোক হাটা-হাটিও করছিল।

আমার পাশে বসা নানাটি নাতিকে কমলা খেতে দিয়ে একটা *নেভি* সিগারেট ধরালেন।

সিগারেটের ধোয়ায় এমনিতেই আমার কষ্ট হয়, তার উপর এ কড়া সিগারেট! কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। হুট করে আবার কাউকে কোনো কিছু বলতে পারি না। বরং একটু আমার বামপাশে চেপে গিয়ে দৃষ্টিটা ট্রেনের বাইরে দিলাম। দেখলাম মাঠ, ক্ষেত, গাছগুলো কি সুন্দর করে পিছিয়ে যাচ্ছে। সবুজ ধান গাছগুলো বাতাসে দুলছে এদিক-ওদিক।

কিন্তু হঠাৎ করেই যেন আমার স্নায়ুগুলো অন্য কোনো এক অজানা ঘ্রাণে সাড়া দিল। একটু নড়েচড়ে বসলাম খেয়াল করলাম আমার পাশের মহিলাটি ইতিমধ্যে আমার কাধে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছেন।

ঘ্রাণটা তার শরীর থেকেই আসছে। একটি মেয়েলি ঘ্রাণ। তার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করতে গিয়ে আমার হোচট খাবার উপায়। এই তো সেই মেয়ে যার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল এই কিছুক্ষণ আগে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। তিনি একটা কলেজে পড়ান, বাবার সঙ্গে এখানে এসেছেন বোর্ড পরীক্ষার খাতা নেয়ার জন্য। বাপ-বেটিও হরতালের কারণে আমার মতো এই ট্রেনে। আমরা যে ট্রেনে উঠেছি, এর আগে আড়াইটায় একটি ট্রেন ছিল। তারা সেই ট্রেনের টিকেট কেটেছিল। কিন্তু ওটি কোনো কারণবশত এখানে আসেনি তাই এই ট্রেনে তারা উঠেছেন।

এসব যখন ভাবছি তখন ট্রেনের ভেতরে অন্ধকার হয়ে উঠেছে। পাশের যাত্রীকেও ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না। এমন সময় কাধে মাথা রাখা ম্যাডাম হঠাৎ নড়েচড়ে আরো কাছে এসে বসলেন। হু হু বাতাসে তার নীল শাড়িটি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তিনি তার ডান হাতটি দিয়ে আমার কাধ সাপের মতো পেচিয়ে ধরলো এবং আমার ডান হাত নিয়ে তার বুকের বিভিন্ন জায়গায় ডলতে লাগলেন।

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কি করবো বুঝতে পারছি না। কিন্তু তিনি তার কাজ চালিয়েই যাচ্ছেন আর তার মুখ দিয়ে অদ্ভুত ধ্বনি বের হতে থাকে।

এর মধ্যে আমার অবস্থাও খারাপ।

আমি আর ঠিক থাকতে না পেরে তার স্তন খামচে ধরি।

তিনি আস্তে করে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, ভেতর দিয়ে হাত দাও।

এক এক করে তার ব্লাউজের হুক খুলে দেখি ভেতরে ব্রা পরা। ব্রা-র ওপর দিয়েই চাপ দিতে থাকি।

তিনি আমার কানে কামড় দিয়ে বলেন, বোকা। বলেই তিনি ব্রা নিচে নামিয়েই ব্রা-র ওপর দিয়ে স্তন বের করে দেন।

আমিও সমানে তার স্তনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকি। তিনিও বসে না থেকে আমার প্যান্টের জিপার খুলে ওটা নিয়ে নড়াচড়া করতে থাকেন।

এক সময় নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার হাত তার স্তন থেকে নেমে পেট-পিঠ এবং আরো অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

তিনি আবার আমার হাত নিয়ে তার স্তনে চাপ দিতে দিতে বললেন, ওহ সোনা! আমাকে পিষে ফেলো।

তার স্তনের বোটায় আরো জোরে চাপ দিই।

এতে তিনি ঠিক থাকতে না পেরে আমার কাধে এমন জোরে কামড় দেন যে ব্যাথায় আমি গোংড়াতে থাকি।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি তার ঠোট জোড়া আমার মুখের ভেতরে পুরে দেন।

এমন সময় স্পিকারের মাধ্যমে ভেসে এলো একটি মেয়েলি কণ্ঠ, আমরা আর কিছুক্ষণের ভেতর খুলনা স্টেশনে পৌছাবো। আপনারা যে যার মালপত্র গুছিয়ে নিন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে আমার থেকে মুক্ত করে তার কাপড় চোপড় ঠিক করছেন। এমন সময় ট্রেনের লাইট জ্বালিয়ে দেয়া হলো।

কর্তৃপক্ষকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম এতোক্ষণ লাইট বন্ধ করে রাখার জন্য।

লাইটের আলোয় তার দিকে তাকিয়ে আমি এবং তিনি দুজনেই লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম।

তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন এটা কোনো ব্যাপারই না। তুমি খুলনায় কোথায় উঠবে?

বললাম।

ভালো থেকে বলে তিনি তার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে গেল।

পরে আমিও কুলি ডেকে আমের কার্টন নিয়ে রিকশায় উঠলাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কুষ্টিয়া থেকে

ডাবল জাঙ্গিয়া রহস্য

- রোমার

১৯৭৭-৭৮ সালের ঘটনা। বাবার চাকরির সুবাদে পার্বতীপুর বাসা আমাদের। পার্বতীপুর থানা তখন খুবই অনুন্নত। বাজার-ঘাট করা, সিনেমা দেখা, বেড়ানোসহ সব কিছুর জন্যই আমাদেরকে তখন পার্শ্ববর্তী থানা শহর সৈয়দপুর যেতে হতো। আর সৈয়দপুর যাওয়ার একমাত্র বাহন ট্রেন। আমরা দুপুর দুইটার ট্রেনে সৈয়দপুর যেতাম এবং সব কাজ শেষে সন্ধ্যার ট্রেনে পার্বতীপুর ফিরে আসতাম।

একবার বিশেষ জরুরিভাবে প্র্যাকটিকাল খাতা কেনার জন্য সৈয়দপুর যেতে হবে। যদিও শরীরের অবস্থা ভালো না। পেটের গণ্ডগোল ভীষণ। তবুও যেতে হবে।

অগত্যা দুটার ট্রেনে রওনা হলাম। ট্রেনের দোলায় আমার পেটের অবস্থা কাহিল হতে লাগলো। কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রেখে যখন আর উপায় নেই ঠিক তখনই ট্রেনের টয়লেটে ঢুকলাম। আমার অবস্থা খুবই করুণ। কোনো কিছু চিন্তা না করে প্যান্ট খুলে বসে পড়লাম।

কাজ শেষে সে কি শান্তি! কিন্তু পানির জন্য ট্যাপে হাত দিয়েই আক্কেল গুড়ুম অবস্থা। ট্যাপে পানি নেই। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। গা ঘামতে শুরু করলো। শেষে অনেক চিন্তা করে কোনো উপায় না পেয়ে জাঙ্গিয়া দিয়ে পানির কাজ সারলাম এবং জাঙ্গিয়াটা ফেলে দিলাম। জাঙ্গিয়া ছাড়াই প্যান্ট পরে সৈয়দপুর গেলাম। জাঙ্গিয়া ছাড়া প্যান্ট পরার সে যে কি বিড়ম্বনা তা যদি কেউ পরে থাকেন সেই বুঝবেন।

যাক, সেদিন থেকে ওই বিড়ম্বনার কথা স্মরণ করে আজো ডাবল জাঙ্গিয়া পরি। কেন পরি তা আমার গিন্নিকেও বলিনি।

সূত্রাপুর, বগুড়া থেকে